গ্রন্থাগারবিদ্যা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারবিদ্যা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—আগস্ট ১৯৬৮
মূল্য—আট টাকা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৬।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁর উৎসাহে এবং সহায়তায়
গ্রন্থাগারবিদ্যায় আমি যৎকিঞ্চিৎ পারদর্শিতা লাভ করতে পেরেছি,
যিনি আমার গুরুপ্রতিম এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন,
বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য, পরলোকগত

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের স্মরণে

সশ্রদ্ধ নিবেদন।

মুখবন্ধ

গ্রন্থাগারবিদ্যা বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ব্যবহারিক বৃত্তি হিসেবে বিশেষ শিক্ষণের এবং বিশিষ্টতার আসন ক'রে নিতে সুরু করেছে সাম্প্রতিক কালে। শিক্ষাজগতে গ্রন্থাগারের স্থান অপরিহার্য হ'লেও গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিটা এতকাল বিশেষ কলকে পায়নি। গ্রন্থাগার থাকলেই একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মী থাকবেন, এবং তিনি হয় পুরা সময়ের নয়তো খণ্ডিত কালের কড়ারে কাজ করবেন এটা জানা কথা। তবে তাঁর ধরন এবং মর্যাদা কেমন হবে বা হওয়া উচিত তাই নিয়েই সমস্যা। দেশ-জোড়া অগণিত ছোট-বড় গ্রন্থাগারের সুবাদে নেপথ্যবর্তী বহুতর অনুজ্জ্বল কর্মীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়াদি বিশেষ গ্রন্থাগারের মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান গ্রন্থাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ এতাবৎকাল মিলেছে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি গ্রন্থাগারিকদের মান-মর্যাদা এবং গ্রন্থাগারগুলির পরিধি-পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিমাণেও বাড়ছে। তবু,—গ্রন্থাগার-জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রঙ্গনাথনের কথা এবং আরো কিছু তারকার আলোক বিকিরণের কথা মনে রেখেও,—একথা বলতে দ্বিধার কোনো কারণ দেখিনা যে গ্রস্থাগার এখনো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তা-ব্যক্তি মহলে,—এমনকি জনসাধারণ্যেও—অবহেলিত। ভাবতে অবাক লাগে—শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের কেন্দ্রবিন্দু যে-গ্রন্থাগার, তা এমনভাবে অবহেলিত হয় কেমন ক'রে। এমন মনোভাবের সৃষ্টিই বা হয় কোন সূত্রে যে, যে-কোনো স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানের ব্যক্তি অন্যত্র চাকরি না পেয়ে, অথবা অন্যবিধ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, এবং—বলা বাহুল্য—গ্রন্থাগারবিদ্যার বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত না হ'য়ে এই বৃত্তিতে প্রেরিত হয় নির্দ্বিধায়। নানাবিধ সামগ্রীর দোকান বা গুদামঘরের পাহারাদার এবং হিসাব-বরদারের মতোই 'গ্রন্থগুদামেও' কেবলমাত্র প্রহরী অথবা পেয়াদা হিসেবেই দেখা হয় গ্রন্থাগারকর্মীকে। তবে একথাও বেশ জোরের সঙ্গেই বলব, এই অবহেলার ভাবটা উচ্চতর মহলে,—অর্থাৎ যাঁরা ভেবে-চিন্তে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কল্পনা-পরিকল্পনা ক'রে কিছু করলেও করতে পারতেন,—তাঁদের মধ্যে যতটা প্রকট সাধারণের মধ্যে তেমন নয়। গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষা-

বিস্তারে এবং সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে বেঁচে-বর্তে আছে কেবলমাত্র কিছু পরিমাণ উৎসাহী সাধারণ কর্মীর স্বার্থহীন অনলস প্রচেষ্টার ফলে।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে চলতি ধারণা এই যে এটি শুধু কিছু বই এবং সাময়িকীর সংগ্রহশালা। গ্রন্থাগারিকের কাজ সেগুলিকে তাকের উপরে সাজিয়ে রাখা এবং পাঠকের মর্জিমতো সরবরাহ করা। বৃত্তিটা কেবলমাত্র অছিদারির। তবে এই সংকীর্ণ ধারণাটা আজকাল ক্রমে ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগার সমাজ কল্যাণ-কেন্দ্র এবং শিক্ষা-সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রকল্পে তার ইঙ্গিত মিলছে। পুরোপুরি আভিজাত্য পেতে হয়ত এখনো অনেকদিন লাগবে। দুঃখের বিষয়, বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী উচ্চ পর্যায়েও এখনো পর্যন্ত সংকীর্ণ মনোভাব দেখা যাচ্ছে। আমি অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দিতে পারি। কোনো প্রবীণ এবং বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সময়ে দেখা গেল নির্বাচনী উপসমিতিতে কোনো গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ নেই, উপরয়ালা কর্তারাই কর্মটি সম্পন্ন ক'রলেন। দ্বিতীয়, আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক প্রমুখ গ্রন্থাগারবিদ কর্মীদের পদমর্যাদা এবং বেতনক্রম নির্ধারণের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। তৃতীয়, জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নির্বাচনী সভাতে হোমরা-চোমরা হিসেবে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কোনো গ্রন্থাগার-বিশারদের সাক্ষাৎ মেলেনি। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তো এখনো পর্যন্ত গ্রন্থাগারাধ্যক্ষই নেই, কোনো অধ্যাপকই গ্রন্থাগারিক হিসেবে পদটি অলঙ্কৃত ক'রে থাকেন। হয়ত বা এই বৃত্তিটিকে এঁরা সকলেই কেবলমাত্র দপ্তর-পরিচালনা এবং/অথবা হিসাব রক্ষকের কাজ ব'লেই মনে করেন। তদূর্ধ্ব আর কিছু ভাবতে পারেন না। অথবা কারণটা আরো ঘোরালো। কোন্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হবে সেটা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, আবেদনকারীদের আহ্বান ক'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটা নিয়ম রক্ষা মাত্র। মনোনীত হয়ে-থাকা প্রার্থীটির নিয়োগে যাতে কোনো বাধার বা হাঙ্গামার সৃষ্টি না হয় সেজন্য মনোমত লোক নিয়ে নির্বাচনী সভার গঠন।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে গ্রন্থাগার কর্মীদেরই সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে নিজেদের কথা নিজেদেরই ভেবে দেখতে হবে। উপর-মহলের মুখ চেয়ে ব'সে থাকলে

চলবে না। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ, গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি প্রভৃতিতে গ্রন্থাগার-বিশারদ বা গ্রন্থাগার-সচেতন সদস্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে কোনো অপরিজ্ঞেয় অপরাজেয় শক্তিতে এই কর্মীশ্রেণী অনেকাংশেই বৃত্তিগতভাবে অবহেলিত। পদ, মর্যাদা, বেতনক্রম, কর্মীনিয়োগ কোনোটাই উপদেষ্টা সমিতির হিসাবের অনুপাতে হয় না। একজনের ঘাড়ে দশজনের বোঝা চাপিয়ে কর্তৃপক্ষ নির্বিকার থাকেন। যেমন, একটা সহজ সত্য এই যে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের অনুপাত ছাত্রদের আনুপাতিক হারে বিশেষ বাড়ে কমে না, দশজন বা ত্রিশজনকে একজনই অধ্যাপনা করতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থাগারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মীবৃদ্ধি অপরিহার্য। আবার, গ্রন্থাগার ছোট হ'লেও কেবলমাত্র একজন কর্মীদ্বারা তার পরিচালনা সম্ভব হয় না, যেমন কোনো বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা কম হ'লেও একটিমাত্র শিক্ষক দিয়ে কাজ চলে না। এই সত্যটা যেন কারো বড় একটা খেয়াল থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রেখে আমাদেরই সর্ববিষয়ে সচেতন হ'তে হবে। সচেতনতার প্রকাশ দাবি-দাওয়া উপস্থাপনাতে সীমাবদ্ধ নয়। গ্রন্থাগারবৃত্তিকে অভিজাত ক'রে তুলতে হবে তার বিভিন্ন করণীয় এবং উপকরণের ব্যাপ্তিতে। কর্মধারার বৈশিষ্ট্য এবং পরিধি বাড়াতে হবে। আমাদের জন্য কী করা হ'ল বা হ'ল না তা না ভেবে আমরা কী করতে পারি তাই ভাবতে হবে।

গ্রন্থাগারবিদ্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধের এই সংকলনের সূত্রে এত কথা বলবার কারণ এই যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক বা দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতির বিবরণই আমার এই প্রবন্ধগুলিতে লিপিবদ্ধ করিনি, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগারবৃত্তিকে—তার ব্যাপক পরিমণ্ডলটিকে—উপস্থাপিত ক'রবার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থাগারের কর্মধারা সূত্রে যেসব প্রশ্ন মনে জাগে, যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয় এবং যে সব দিকে নজর নিয়ে চলতে হয় তাই বলবার প্রয়াস পেয়েছি। গ্রন্থাগারকর্মী জানেন তাঁর কাজ কত বিচিত্র এবং কী পরিমাণে ব্যাপক। কিন্তু সাধারণ পাঠকরাও সে দিকটা ভেবে দেখবেন সেই আশা আমরা করি। সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারের কাজ চার দেয়ালের মধ্যে তো সীমাবদ্ধ থাকেই না, কেবলমাত্র নিজ লোকালয়ের এলাকায়—এমন কি নিজ প্রদেশ বা দেশের মধ্যেও আবদ্ধ থাকে না। দেশান্তরে বিস্তৃত হ'য়ে আন্তর্জাতিক রূপ নেয়। এক দেশের এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটা বা উন্নত

জীবনযাত্রার জোয়ার অন্য দেশে এসে হাজির হয়,—ছড়িয়ে পড়ে জগৎ জুড়ে। কী রাজনীতি, কী রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞানের পদক্ষেপ বা শিক্ষার সমারোহ,—সব কিছু নিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত একটা অদৃশ্য অথচ অচ্ছেদ্য সুতো দিয়ে বাঁধা র'য়েছে। তাই আলজেরিয়ায় বা ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বাধলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, মার্কিন মুলুকে বা চীনের চত্বরে আণবিক বোমা ফাটলে সারা পৃথিবী কেঁপে ওঠে, কেনেডি দ্বীপে বা রুশী রঙ্গমঞ্চে কৃত্রিম গ্রহক্ষেপের ফলাফলের দিকে উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানী। এই সমস্ত কিছুই বিশ্বজোড়া গ্রন্থাগারকে স্পর্শ করে। কেননা, সর্বজনের জানবার—ঔৎসুক্য মেটাবার—জ্ঞান বিকিরণের প্রকৃষ্টতম প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার। সচেতন সমাজ-প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোনো গ্রন্থাগারই সমগ্র জগতের গতিশীলতার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেনা। যে-কোনো ঘাত-প্রতিঘাত সংস্কার-সংগঠন সম্পর্কেই করণীয় কিছু থাকে। মানব-জমিনের আবাদ ক'রে সোনা ফলানোর হাল ধরতে হয়। চিন্তানায়কদের ফসল সঞ্চিত থাকে গ্রন্থে, রূপায়িত ক'রে তুলতে হয় জীবনে। সেই গ্রন্থ-সম্পদ বা চিন্তাধারা এবং জীবনধারার মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে থাকে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার-কর্মী সমাজের সকল স্তরে নানান উপায়ে—নব নব পদ্ধতিতে সেই চেতনা সঞ্চারিত করেন।

এই গ্রন্থে সংবদ্ধ প্রবন্ধগুলি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায়, এবং সাপ্তাহিক 'অমৃত', ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি সাময়িকীতে প্রকাশিত হবার পর পাঠকদের পক্ষ থেকে কিছু অভিনন্দন এবং আলোচনায় স্বীকৃতি পেয়েছিল। এ সৌভাগ্যের উল্লেখ এখানে এজন্য করছি যে গ্রন্থাগারের বিবিধ কর্মধারা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণের ঔৎসুক্য ও সচেতনতা আমাদের উৎসাহিত করে। গ্রন্থাগারকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তৃপ্তি পাই এই ভেবে যে গ্রন্থাগারের আপাত-বিষণ্ণ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতি যেমনই হোক না কেন, জনগণের এই চেতনা গ্রন্থাগারকর্মীর সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত হ'য়ে এই বোধকেই প্রত্যক্ষ করে যে বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও মতবাদের সাম্প্রতিক নেতৃত্বের বিহ্বলতার মধ্যে গ্রন্থসম্পদই একমাত্র সত্য ও শান্তির, কল্যাণ ও সংস্কৃতির ধারক। সোচ্চার নয়, অথচ অনিবার্য। এই মহল থেকে ঠিক পথের নিশানা দেবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারকর্মীর।

বর্তমান বাস্তবে যেমন দৃষ্টি রাখতে হয়, তেমনি অতীত থেকে পাঠ নিতে হয়, উপলব্ধি করতে হয় ভবিষ্যতের স্বরূপ। তাই রবীন্দ্রনাথও প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ে বলে গিয়েছেন, "লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ"।

পরিশেষে এই পুস্তকের প্রকাশক, বিদ্যানুরাগী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উৎসাহী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস মহাশয়কে আমার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য এবং সেই সূত্রে নানাবিধ কার্যকর পরামর্শ প্রদানের জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

শান্তিনিকেতন
১০ আষাঢ়, ১৩৭৫

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উপগ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী

সূচীপত্র

গ্রন্থাগার বিদ্যা

গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ গ্রন্থ নিয়ে।

'প্রধান কাজ' বলবার কারণ এই যে আজকাল গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে নানা-ধরণের সংস্কৃতিমূলক, শিক্ষাবিষয়ক, ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ব্যাপ্তি সূচিত হচ্ছে।

সমগ্র বিষয়টির আলোচনা করতে গেলে গ্রন্থের কাজ কী তা বুঝতে হয়।

মানুষের পরিচয় সাধারণভাবে দুই ধরণের। প্রথমটি একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সামাজিক। ব্যক্তিক এবং ব্যষ্টিক। মানুষের চিন্তার ধারা স্মৃতিশক্তিকে নির্ভর ক'রে চলে। তা না হ'লে চিন্তার মধ্যে কোনো পারম্পর্য থাকে না। আত্মগত ভাবে সে নিজের চিন্তা—নিজের জন্য চিন্তা ক'রে যেতে পারে, তাতে বাইরের আর দশজনের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আবার তার সেই চিন্তা সমাজে প্রতিফলিত অথবা সমাজের প্রতিফলন হ'তে পারে। সেই চিন্তাতেই তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, তার সামাজিক পরিচয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর ক্রমে কথা বলতে শেখে, চিনতে বুঝতে শেখে। এই শিক্ষার সবটাই তার মধ্যে ধ'রে বেঁধে সঞ্চারিত করা হয়না। পারিপার্শ্বিক থেকে সে তা আহরণ ক'রে চলে। নিজের গরজেও সে শেখে। এই হ'ল মানুষের গোষ্ঠিনির্ভরতা, সমাজবদ্ধতা।

সামাজিক কতকগুলো নিয়মকানুন বিধিনিষেধের কাঠামোই যে সমাজের পরিচয় তা নয়। সামাজিক কোনো বিধি লঙ্ঘন দ্বারাই কেউ সমাজ বহির্ভূত হয়ে যায় না। তাই আস্তিক নাস্তিক বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেই এক সমাজভুক্ত। মানুষের যে কোনো কাজ বা চিন্তা কোনো না কোনো ভাবে সমাজে সঞ্চারিত প্রতিফলিত হয়। আবার সমাজবদ্ধ বা সমাজছিন্ন যে ধরণের চিন্তাই সে করুক না কেন তা ঐ সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়।

এই চিন্তার ধারক যেমন ব্যক্তি, তেমনি তার প্রচারক লৈপিক সামগ্রী,—আজকালকার দিনে গ্রন্থ। 'গ্রন্থ' বলতে এখানে যাবতীয় মুদ্রিত অমুদ্রিত প্রচার সম্ভার এবং তার ধারককে বলা হচ্ছে। এককালে এক দেশের গ্রন্থ আরেক দেশে যাওয়ার কাজ সহজ ছিল না। এখন তা অনায়াস হয়েছে। আবার গ্রন্থ ব্যতীত তার-বেতারের নানান মাধ্যমেও এক দেশের রচিত সামগ্রী

অন্য দেশে যাচ্ছে। এইভাবে এক দেশের সামগ্রী সম্ভার অন্য দেশে স্থান পাচ্ছে, এক সমাজের চিন্তাধারা অন্য সমাজে প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং এখন আর গ্রন্থাগারের কাজ গ্রন্থমাত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। এমন কি সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিক গণ্ডীতেও আবদ্ধ হ'য়ে নেই।

স্মৃতি বা চিন্তা মানুষের পক্ষে যা, লিপি বা প্রতিলিপি সমাজের পক্ষে ঠিক তাই। মানবমনে চিন্তা যেমন যুক্তির পরতে গেঁথে ওঠে, সমাজের চিন্তন তেমনি পরতে পরতে গাঁথা থাকে গ্রন্থারাজিতে। অধুনা গ্রন্থে, রেকর্ডে, টেপ্-এ, এবং বিচিত্রতর মাধ্যমে। সমগ্র মানব-সমাজকে একটা দেহ ভেবে নিয়ে তার মননশীলতার কর্মকেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। সমাজদেহের হৃৎস্পন্দনের পরিমাপক গ্রন্থরাজি। মানুষের ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ তার মধ্যে বিধৃত। তার একদিকের চিন্তাধারা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানপন্থী, অপরদিকের চিন্তাধারা কল্পনামুখী, প্রবণতানির্ভর। মানুষের কর্মধারাকে এই দুই তীরের মধ্যে বহমান রেখে চলে তার যাবতীয় ক্রিয়াপদ্ধতি,—যা লিপিবদ্ধ হয়ে থরে থরে সজ্জিত থাকে বংশানুক্রমিক ব্যবহারের অপেক্ষায়। সেই ব্যবহারবিধিকে সংগতিপূর্ণ এবং গতিবান করে গ্রন্থাগার।

একদা মনে করা হ'ত,—একদা কেন, এখনো বহু রথীমহারথী পাত্রমিত্র সভাসদ মনে করেন,—গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রন্থসংরক্ষণ এবং পাহারাদারি। গুদামজাত মালপত্রের জন্য দ্বারবান, দোকানদারিতে বিক্রেতা, টিকিট ঘরে টিকিট কাটা যেমন, তিনিও তেমনি পুস্তকের লেনদেন ক'রেই খালাস। গ্রন্থের প্রয়োজন এবং অনুধাবনের ব্যাপারে তাঁর করবার কিছু নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা ক্রমে বুঝতে শেখাচ্ছে যে গ্রন্থাগার পরিচালনা একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান তাহলে কেমন ধরণের বিজ্ঞান? স্বাভাবিক চিন্তাবিকাশ-পদ্ধতির ধারা অনুসরণই গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা; বস্তুবাদী সংগঠন প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় সাধন। প্রতিটি বিষয়ের অংশ বিভক্তি দ্বারা পরস্পরের একক ও সংযুক্ত বৃত্তি নিরূপণ। ক্রিয়াপর্বের গুণ এবং পরিমাণ নির্ণয়। এক পদ্ধতি থেকে আরেক পদ্ধতিতে, এক যুক্তিবাদ থেকে আরেক যুক্তিবাদে যাতায়াতের সেতু গঠন। এক কথায়, ক্রিয়াপর্বের ধারা বেয়ে কর্মকাণ্ডে যাবার রাস্তা বাৎলাবে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান। সমগ্র জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে বাস্তবমুখী করবার প্রেরণা জোগাবে, জ্ঞান-জমিনের জরীপ করবে।

এইজন্য গ্রন্থাগারিককে বিষয় সমূহের বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক দিক, সামাজিক দিক, মননের বা মনস্তত্বের দিক, এবং সর্বোপরি ব্যবহারিক দিক। কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হ'য়েও তাকে চোখ কান খুলে রাখতে হবে বিষয় নির্বিশেষে। সমগ্র জ্ঞানকাণ্ড থাকবে তার গ্রন্থসজ্জায় ধারাবাহিকতায় বিধৃত। প্রাচীন মতে যেমন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ,—এই চার রাস্তার বিভিন্ন বাঁক বিধৃত, তেমনি আধুনিক দৃষ্টিতে দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান থেকে স্থরু করে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাসে তার জরীপের ক্ষেত্র বিস্তৃত।

আজকের দিন সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বিশেষজ্ঞতা অর্জনে সীমায়িত। নিজ বিষয়ের বাইরে পা বাড়াবার সময় যেমন নেই, প্রয়োজনও তেমনি হয় না। অথচ শিক্ষার্থী বা জ্ঞানান্বেষীর বেলায় এই বেড়া খাড়া রাখা যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এখন দুটো ধারা চিহ্নিত হয়েছে,—সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ,—বৈজ্ঞানিক বিষয় এবং মানবিক বিষয়। এই দ্বিভাগ স্থত্রে মনে হ'তে পারে যেন বিজ্ঞানের ধারার সঙ্গে মানবিক ধারার যোগ নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা প্রয়োগ পদ্ধতি যতই বস্তুনির্ভর হোক না কেন তার চিন্তার ভিত্তি দার্শনিক। মানবিক বিষয়াবলী যেখানে বস্তুভিত্তিক রূপকল্পের মধ্য থেকে নানান্ স্থত্র এবং নানাবিধ যোগস্থত্র আবিষ্কার করে, বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলী করে তারই নির্বিকল্প প্রয়োগ। মননের ধারাতেও যেমন স্থষ্টির বা বিনষ্টির বীজ থাকতে পারে, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের মধ্যেও তেমনি থাকে শান্তির বা সংহারের অঙ্কুর। এ দু'য়ের সমন্বয় সাধনেই কল্যাণ। মানুষের চিন্তাধারা একপেশে হ'য়ে পাছে বিপর্যয় ঘটায় সেজন্য এ দলের শিক্ষার্থী ও দলের বিষয়ও কিছু কিছু পাঠ করবার আবশ্যিকতা বোধ করছে। নচেৎ বিজ্ঞানের বস্তুমায়ায় অথবা জ্ঞানমার্গের কল্পমায়ায় বিচরণই সার হবে।

এই বোধের বিচরণ ক্ষেত্র বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে যেমন নেই তেমনি শিক্ষকের আওতায়ও নেই। তা আছে গ্রন্থাগারে। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক যদি না সচেতনভাবে সহায়ক হন তাহলে বিদ্যার্থীর বিভ্রান্তি অনিবার্য। তাই আজ কোনো শিক্ষাবিদ্ যদি মনে করেন যে বইএর বাহন হ'বার বাইরে গ্রন্থাগারিকের আর কিছু করণীয় নেই তবে তিনি শুধু ভুলই করবেন না, শিক্ষাজগতের ক্ষতিও করবেন। গ্রন্থাগারিককে শিক্ষকের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে যে মণ্ডুকতা লক্ষ্য করা যায় তা আত্মবিস্মৃতির সামিল।

সে যাই হোক, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীরা সর্বসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা নিরসন করবার এবং বর্ধিত করবার জন্য তাদের কাছে পারম্পর্যপূর্ণ বিষয়াবলী তুলে ধরবেন। এক বিষয় থেকে সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে পাঠকের উৎসাহ সঞ্চার করতে পারা চাই। বিষয়ানুকূল্যই নয়, বিষয় বৈভব তুলে ধরা চাই পাঠকের কাছে। তার মনকে জাগ্রত রাখবার, আকৃষ্ট করবার বিবিধ কায়দা আয়ত্তীকরণেই গ্রন্থাগার কর্মীর সার্থকতা।

তাই নানাবিধ উপায় বা'র ক'রে নিতে হয়। যেমন, কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বিশেষ সময়ে তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠকের নজরে তুলে ধরবার চেষ্টা, গ্রন্থসজ্জার বিশেষ কায়দার সাহায্যে পাঠকের আগ্রহ উজ্জীবিত করা, নানান ছবির সাহায্যে কৌতূহলের সঞ্চার, বক্তৃতার সহায়তায় কখনো বা প্রচার, এবং বিশদ গ্রন্থপঞ্জী তথা বিষয়-পঞ্জী প্রণয়ন। শিক্ষক শিক্ষাদান করেন, গ্রন্থাগারিক শিক্ষা ধারণে সহায়ক হন। শিক্ষার ধারা রক্ষায় এবং উদ্দেশ্য সাধনে গ্রন্থাগারের দান বিদ্যায়তনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

গ্রন্থাগারও অনেক রকমের। বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্গে স্বভাবতই সর্বসাধারণের গ্রন্থাগারের প্রভেদ আছে। আবার তার উপরে আছে বিশেষ বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার, যেমন কোনো শিল্প-সংস্থার বা গবেষণা-কেন্দ্রের গ্রন্থাগার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্র যেমন সীমাবদ্ধ পাঠকরাও তেমনি শ্রেণীবদ্ধ। সাধারণ গ্রন্থাগারে শ্রেণীবদ্ধতা না থাকলেও বিশেষ পাঠক্রমের ক্ষেত্রে একটা সীমা মেনে চলতেই হয়। তবে সকল গ্রন্থাগারেরই এক জায়গায় মিল আছে। তা হ'ল এর বৈচিত্র্যমুখীনতা। অর্থাৎ পাঠক্রমের বাইরে জ্ঞানার্জনের সীমাবর্ধনের প্রসঙ্গ। প্রতিষ্ঠানগত পাঠ তালিকায় সীমাবদ্ধ। সে শুধু বৃহত্তর জ্ঞানের বুনিয়াদ তৈরী করে। জ্ঞানার্জনের রাস্তা বাৎলে দেয়। তার পরের ধাপের পাঠই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। এই অঙ্গের স্নায়ুকেন্দ্র গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারই প্রকৃত বিদ্যার আগার। গ্রন্থাগার শিক্ষক-মাধ্যম শিক্ষা ব্যতীত আত্মশিক্ষণের কেন্দ্র, ব্যক্তিগত শিক্ষার স্থান। গ্রন্থাগারই পাঠক্রম-কেন্দ্রিক স্বল্প-শিক্ষা বহির্ভূত স্থায়ী আজীবন শিক্ষায়তন; প্রকৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্থল হিসেবে গ্রন্থাগারে কর্মীদের কর্তব্য পাঠকদের মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের সঞ্চার করা। গ্রন্থে আবদ্ধ বিদ্যার ভাষাহীন ভাষায় প্রাণসঞ্চার করা।

পাঠকদেরও জ্ঞানতৃষ্ণার শ্রেণীবিভাগ ক'রে নিতে হয় গ্রন্থাগারিককে। সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠকরা বই প'ড়ে থাকে। কোনো বিষয়ের অনুসন্ধানজনিত জ্ঞানের জন্য, সৌন্দর্যানুভূতি বা শিল্প সৌকর্য উপলব্ধির জন্য, এবং নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য। জ্ঞানার্জনের জন্য যে পাঠক আসে তার উদ্দেশ্য সরল হ'লেও বিচিত্র। সে নিছক মুখস্থ করতে পারে বা অনুচ্ছেদের মর্মগ্রহণে ইচ্ছুক হ'তে পারে, বস্তুকেন্দ্রিক হ'তে পারে তার অনুসন্ধান, অথবা হ'তে পারে পঠিত বিষয়ের মূল্যায়ন। ইতিহাস প'ড়ে সে যেমন ঘটনা ইত্যাদির বিবরণ জানতে চাইবে, বিজ্ঞান প'ড়ে জানতে চাইবে কার্যকারণ যোগ, আবার সাহিত্য প'ড়ে জানতে চাইবে তত্ত্ব। অন্যদিকে, যে পাঠক শিল্প বা সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য বই পড়তে ইচ্ছুক তার বিষয় নির্ধারণ কিঞ্চিৎ জটিল ব্যাপার। কেননা ঐ তত্ত্ব এমন ভাবে ছড়ানো যা বিষয়ে আবদ্ধ হ'তে পারে, রচনা শৈলীতে বিন্যস্ত হ'তে পারে, আবার এসবের উর্ধ্বে আরেক অনুভূতির সামগ্রী হ'তে পারে। তৃতীয়ত, নিছক আনন্দলাভের জন্য পাঠ আপাত দৃষ্টিতে সময় কাটানোর অতি সরল পদ্ধতি ব'লে মনে হ'লেও বিচিত্র তার আয়তন। একেকজনের আনন্দের উপকরণ একেক রকমের। কেউ উপন্যাস বা ভ্রমণ কাহিনী পড়তে পারেন, কেউ পড়বেন কবিতা, আবার কারো কাছে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিই আনন্দদায়ক। এই সময় কাটানোর চেষ্টার মধ্যেও পরোক্ষভাবে জ্ঞানার্জন স্পৃহার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। এবং এই বিবিধ ও বিচিত্র পাঠকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জন তথা চিত্তের প্রসারোপকরণ সাজিয়ে সাহায্য করাতে গ্রন্থাগারের আয়োজিত সম্ভারের সার্থকতা।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গোড়ার কথা তাই মানব-বিজ্ঞান। মানুষের যতরকম জ্ঞান বিজ্ঞানের খেয়াল তাই নিয়ে গ্রন্থাগারিকের কারবার। সুতরাং এই বিজ্ঞানের জটিলতা অনস্বীকার্য। আপাত দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে এ নিয়ে বিবেচনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ মাত্রেই এক রকমের নয়, ছাঁচে ঢালাই করা নয়। একই বিষয়ে আগ্রহী বা একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত পাঠকবর্গ পর্যন্ত পদ্ধতিতে বিচিত্র। ব্যবহারে বিচিত্রতর। বিচিত্র ধরণের মনুষ্যকুল নিয়ে গ্রান্থাগারের যে কাজ তা এক সামাজিক ঐক্যে বিধৃত ক'রে রাখা কুশলী বৈজ্ঞানিক কর্ম।

তবুও গ্রন্থাগারিক সমাজের তরফে গ্রন্থের অধ্যক্ষ, গ্রন্থগত বিষয়ের জোগানদার মাত্র। এই জোগানদারীর কাজে মানুষের শিক্ষাপ্রকরণে বা রুচিগঠনে তার কতটুকু দায়িত্ব আছে তা বিবেচনা সাপেক্ষ। দশজনের চাহিদা অনুযায়ী যদি

তাকে রচনা সম্ভার সাজাতে হয় তবে তার বাইরে চাহিদাকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যাভিমুখী করবার এক্তিয়ার তার কতখানি আছে, এবং সেই সদিচ্ছা তার থাকবে কি না, সে প্রশ্ন হয়ত উঠতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অলিখিত এক চুক্তিতে সে পাঠকের চিত্তকে শুভবৃত্তিমুখী ক'রে তুলবে নিশ্চয়। সমাজের কাঠামো এই কথা বলে, চিৎবৃত্তি এবং হৃদবৃত্তি উন্নত ধরণের করাই মনুষ্যত্ব। তাই অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে পাঠকের বৃত্তিকে অন্যতর খাতে সঞ্চালিত করার কৃতিত্বে গ্রন্থাগারিক প্রশংসার্হ। নমুনা স্বরূপ বলা যায়, সস্তা গোয়েন্দা গল্প থেকে অপরাধতত্ত্বে এবং সেই থেকে সামাজিক হিত প্রসঙ্গে পাঠকের চিত্তকে পরিচালিত করা অসম্ভব নয়।

সমাজের যে অংশ নিয়ে গ্রন্থাগারের কাজ সেই বিশেষ সম্প্রদায় সম্পর্কে,—তাদের রুচি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে গ্রন্থাগারিককে যেমন অবহিত থাকতে হবে, সমাজ বা সম্প্রদায় বিশেষরেও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সেই পরিমাণ সচেতনতা এবং সমমর্মিক দৃষ্টি থাকা উচিত। কেবলমাত্র বিগত শতকে, অর্ধশতকে বা—এমন কি—দশকেই নয়, এখনও লক্ষ্য করা যায় যে গ্রন্থাগারের কর্মী নির্বাচনে কোনো সংহত দৃষ্টি নেই। যে কোনো শিক্ষিত কর্মী অন্য যে কোনো কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচিত হ'য়ে অনায়াসে গ্রন্থগারে 'চালান' যায়। গ্রন্থাগারিকের কাজকে বিজ্ঞানসম্মত মনে করা দূরস্থ বিশেষজ্ঞের কর্ম ব'লেও মনে করা হয় না। কিন্তু বিষয় বহুলতা এবং উপকরণের বিচিত্রতার কথা ভেবে দেখলে এই ভ্রম দূরীভূত হবে। গ্রন্থগার-বিশেষজ্ঞ উচ্চমানের শিক্ষা প্রাপ্ত না হ'লে গ্রন্থনৈবেদ্য সজ্জায়, পাঠকদের চাহিদা সরবরাহে, এবং সর্বোপরি গ্রন্থজ্ঞানে পারঙ্গম হওয়া সুকঠিন। শিক্ষার্থী বা সাধারণ পাঠক পঠিতব্য বিষয় নির্বাচনে এবং অনুসন্ধানে কতখানি গ্রন্থাগারিকের সাহায্যনির্ভর তা সহজলক্ষ্য। গ্রন্থরক্ষণ বা গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ গ্রন্থাগারকর্মীর সামান্যতম কর্তব্যাংশ মাত্র। এমন কি, পুস্তক নির্বাচন, সূচীকরণ, বর্গীকরণ, বিশ্লেষণাদিও আংশিক কর্তব্য সম্পাদন। গ্রন্থাগার কর্মীর প্রধান কর্তব্য বিশেষ অঞ্চলের, সমগ্র দেশের, এমনকি সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা, জ্ঞানলাভের ব্যাপারে পারস্পরিক যোগাযোগ রেখে চলা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উপকরণগুলির নির্ঘণ্ট নির্দেশিকাদি পরিবেষণের জন্য প্রস্তুত রাখা। এই কথা মনে রেখে চললে সামাজিক দৃষ্টি প্রয়োগে গ্রন্থাগারের নবমূল্যায়ন সম্ভব।

গ্রন্থাগারে মনোবীক্ষণ

একথা শুধু আজকের লোকই নয়, প্রাচীন যুগের মানুষও জানতো যে শুধু পুস্তক সংরক্ষণেই গ্রন্থাগারের কাজ শেষ হ'য়ে যায় না। যদিও অনেকে মনে করেন গ্রন্থাগার-কর্মীর আসল কাজটাই হ'ল বই-এর পাহারাদারি করা, তবুও সেই সেই পাঠকেরাও পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এক কালে যখন বই-এর সংগ্রহ এবং কেবলমাত্র বই-এরই ব্যবহার গ্রন্থাগারের প্রধান কর্ম ছিল, তখনও বিদ্যালয়গুলির মর্মস্থল ছিল গ্রন্থশালা। অর্থাৎ শিক্ষা বা সমাজের জীবনের প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রন্থাগার। প্রাচীন ধর্মযাজক, গির্জা, মঠ, বিহার, বিদ্যাপীঠ প্রভৃতির ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। আজকের দিনেও শিক্ষা এবং সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের সেই একই আসন। ক্ষেত্র যেমন বেড়েছে কর্মপদ্ধতিরও বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি।

তাই আজকের গ্রন্থাগার কেবলমাত্র বই-ই যোগায় না, তা সে ইস্কুল কলেজের লাইব্রেরিই হোক বা জনসাধারণের গ্রন্থাগারই হোক, দেশজোড়া যোগাযোগ এবং জটিলতার মাঝে আজকের মানুষের জীবনও জটিল হ'য়ে উঠেছে। এখন শিক্ষা, সংস্কৃতি বা সমাজমন গঠনের নানাবিধ মাধ্যম হয়েছে,—যেমন সিনেমা, রেডিও ইত্যাদি। সে যুগে যখন বিদ্যাপীঠগুলিকে বা ধর্মমন্দিরগুলিকে কেন্দ্র ক'রে গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল তখন সাধারণ পাঠকের সঙ্গে এগুলির তেমন যোগ ছিল না। যাঁরা বিদ্যাশিক্ষা করতে যেতেন তাঁরাই বই পড়তেন। বই-এরও অনেকগুলি ক'রে প্রতিলিপি পাওয়া ছিল কঠিন। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ই বিদ্যাচর্চা এবং ধর্মচর্চা করতেন। বাকি যারা সাধারণ লোক তারা গুরু বা কথকঠাকুরদের কাছে ধর্মকাহিনী শুনত। আর নিজেদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য ছিল রামায়ন গান, কবিগান, তরজা ইত্যাদি। এই সব শ্রুতিগত বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তাদের চিত্ত বিত্তলাভ করত, তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গ'ড়ে উঠত, সমাজমন সচেতন হ'য়ে উঠত।

এখনকার দিনে সমাজমনের গতি নানাবিধ, ধৃতি বহুবিধ। শুধু বই-এর বাজার নয়, সিনেমা, থিয়েটার, সংগীত, রেডিও,—বহুমুখী বাজার। এর সব-গুলিকেই ব্যক্তিমন এবং ব্যষ্টিমন নিয়ে কারবার ক'রতে হয়। এদের উদ্দেশ্য

প্রচার হ'তে পারে, ব্যবসা হ'তে পারে। একমাত্র গ্রন্থাগারেরই উদ্দেশ্য নয় ব্যবসা করা। গ্রন্থাগার সমাজ সেবারই কেন্দ্র। অথচ বড়াই ক'রে সেকথা বলা যাবে না। ঠারে-ঠোরে তাকে কাজ চালাতে হবে, পাঠকের মনকে আদর্শগত মানে উন্নীত করতে হবে। গ্রন্থাগারে সব রকমের পাঠক আসেন, যে যা চান তাঁকে তাই প'ড়তে দেওয়াই উচিত, পাঠকদের দাবী অনুযায়ী বই রাখাই উচিত। তবু সব রকমের সব বই-ই রাখা চলে না। কোনো দলগত বা মতবাদমূলক বই রাখলে তার বিরুদ্ধ মতবাদের বইও রাখতে হয়। সমাজের ক্ষতিকর কোনো বই, বিশেষ ক'রে অশ্লীল সাহিত্য সম্পর্কে খুব সচেতন থাকতে হয়। অথচ পাঠকদের বিবেক জাগ্রত করা কিংবা নৈতিকতার খবরদারি করা গ্রন্থাগারিকের কাজ নয়।

সেই জন্যই গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সমাজমন এবং মানবমনের গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। গ্রন্থাগারে আগত প্রত্যেক পাঠককে সমাজের প্রতিভূ হিসেবে দেখতে হয়। তাঁর ইচ্ছা বৃহত্তর সমাজের ইচ্ছারই এক অংশ। তাই একদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠক যাতে মনঃক্ষুন্ন না হন, অন্যদিকে দেখতে হবে সমাজের কল্যাণ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

কোনো পাঠক এসে হয়তো চাইলেন মোহন সিরিজের বই, কিংবা সিনেমার পত্রিকা। এ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বই-এর প্রতি আগ্রহ নেই। অথচ এই জাতীয় পুস্তকপাঠে যে ধরণের কল্পনা বিলাস বা উত্তেজনার নিবৃত্তি হয় সেটা জীবনের উচ্চতর মানে গিয়ে পৌছয় না। মানুষের ইচ্ছা সহজ সাধারণ সুখ সুবিধা নিয়ে মশগুল থাকতে, কিন্তু মন আসলে চায় তৃপ্তি। তৃপ্ত না হলে অস্থিরতা কমে না, আকাঙ্ক্ষা বেড়েই যায় এবং মানুষ কতকগুলি সুখদায়ক ইচ্ছার বশীভূত হয়। কিন্তু একবার তৃপ্তির রাস্তাটা পেয়ে গেলে আর মন এদিকে ওদিকে হেলে না। সাধারণের ইচ্ছাটা কাজকর্মের আবর্তের মধ্যে প'ড়ে সাময়িক সুখ বা সহজলভ্য স্ফূর্তির দিকে ঝোঁকে। সুতরাং নিছক গল্পের উন্মাদনা বা সিনেমা বিলাসিতার মধ্যে যা'তে পাঠক আবদ্ধ না থাকেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর পাঠরুচিকে উন্নততর খাতে পরিচালিত করা গ্রন্থাগারকর্মীর কর্তব্য। অথচ পাঠককে উপদেশ দেওয়া বা সৎসাহিত্য বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা চলবে না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। পাঠক ভাবতে পারেন তাঁকে হীন মনে করা হচ্ছে। ভাবতে পারেন তাঁর রুচির প্রতি কটাক্ষ

করা হচ্ছে। তাই তাঁর পাঠস্পৃহা এবং দাবীর প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে তাঁকে উক্ত বই-এর সঙ্গে বা তাঁর নির্বাচিত বইয়ের বদলে ঐ বিষয় সম্পর্কিত অন্য দু' চারটি বই প'ড়তে উৎসাহিত ক'রতে হবে। ক্রমে তাঁর আগ্রহ জাগবে। তখন হয়তো পাঠক মোহন সিরিজ থেকে উন্নত ধরণের ডিটেকটিভ গল্প, সেই থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ নির্ণয় সংক্রান্ত গোয়েন্দা কাহিনী এবং তার থেকে অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবেন। সিনেমার নায়ক নায়িকা কী খান, কী পরেন, সেই সব ছবি দেখে এবং প'ড়ে তৃপ্ত না থেকে ক্রমে ক্রমে সিনেমার শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য জেগে উঠবে। এইভাবে অলস কল্পনাবিলাস থেকে জন্ম নিতে পারে খাঁটি অনুসন্ধিৎসা এবং সমাজ কল্যাণের কাজে লাগতে পারে তাঁর অধীত বিদ্যা অথবা বিদ্যার প্রয়োগ।

এ সমস্তই নির্ভর করে পাঠকের মন বুঝে দেখার উপরে। শুধু তাক থেকে বই এনে দেওয়া আর তুলে রাখাই গ্রন্থাগারিকের মুখ্য কাজ নয়। বই-এর দোকানে কোনো বিশেষ বই কিনতে গেলে কুশলী বিক্রেতা যেমন সেই বইটি না থাকলেও তার বদলে ঐ জাতীয় কিছু বই ক্রেতার সামনে এনে ধরেন এবং কিনতে প্রলুব্ধ করেন, গ্রন্থাগারের কর্মীও তেমনি পাঠককে অধীতব্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণে প্রলুব্ধ করবেন। বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্যা কম। কেননা সেখানে ছাত্রছাত্রীর দল সাধারণতঃ অধ্যাপকের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ পাঠক্রম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পড়েন। সেখানে তাদের সাধারণ প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারিককে যৎসামান্য খবরদারি করলেই চলে। জাতিগঠন বা চরিত্রগঠনের যে সামাজিক দায়িত্ব সেটা কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকের উপরে থাকে না, বেশির ভাগই থাকে শিক্ষক সম্প্রদায়ের উপরে। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে এই দায়িত্ব সর্বাংশেই গ্রন্থাগারিকের। ভালমন্দ বিচারের ভার তাঁরই এবং পুস্তক নির্বাচন থেকে বিতরণ পর্যন্ত সব দিকেই তাঁকে নজর রাখতে হয়।

শুধু পাঠকের প্রবণতা বিচার করলেই কাজ শেষ হয় না। গ্রন্থেরও একটা প্রবণতা আছে। অর্থাৎ বইটি কী ভাবে লেখা হয়েছে সেটা লক্ষণীয়। লেখকের মন প্রতিফলিত হয় পুস্তকে। প্রতিটি পাঠকের মতো প্রত্যেক লেখকও সমাজবদ্ধ ; সুতরাং লেখকদেরও বিচার করে দেখতে হয়। বই-এর বিষয় নিরীহ বা দুরূহ যাই হোক না কেন, লেখক কী ভাবে লিখছেন এবং কোন ভঙ্গিতে প্রকাশ করছেন সেইটাই গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রকাশভঙ্গির তারতম্যে

আপাত অশ্লীল জিনিসও স্খলিত হ'তে পারে, উত্তীর্ণ হ'তে পারে প্রশংসনীয় শিল্পকৃতিতে। আবার লেখার উদ্দেশ্য নীতিগঠন হ'লেও বলবার ত্রুটিতে অপাঠ্য হ'তে পারে। নীতিকথার মোড়কে দুর্নীতি ছড়ানোর নজির খুঁজলে পাওয়া যায়। কোনো কোনো পত্রিকাতে দেখা গেছে অন্যান্য পত্র-পত্রিকার অশ্লীল সাহিত্যের নিন্দা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে বাছাই করা মোক্ষম অংশ-গুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হ'য়েছে বহুল পরিমাণে। ফলে মুখরোচক বিষয়গুলির জন্য সেই সব নিন্দিত পত্রিকাগুলি না কিনে উক্ত কাগজের একটি কিনলেই চলে। এই ধরণের সমালোচনার উদ্দেশ্য মহৎ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু পন্থাটা হয়তো রুচিপূর্ণ নয়। পত্রিকার কাটতির এটা একটা কৌশলও হ'তে পারে। তবে সাময়িক পত্রিকার ব্যাপার এমন পাঁচমিশেলি যে খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে বাছাই-এর কাজ করা যায় না। নিকৃষ্ট মানের এবং সস্তা রুচির কাগজেও টাকার মোহে পড়ে ভাল ভাল লেখকরাও রচনা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন না, এবং রুচিবান পাঠক অনেক সময়ে দোটানায় পড়েন। কিন্তু গ্রন্থাদি স্থায়ী সাহিত্য। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন করতে হয় বিবেচনা ক'রে। গ্রন্থাগারিক লেখার মধ্যে দিয়ে লেখকের মন বুঝে দেখবেন, একই বিষয়ের প্রকাশভঙ্গির তারতম্য সম্বলিত বিভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বই গ্রন্থাগারে রাখবেন এবং পাঠকদের মেজাজ বা ঝোঁক বুঝে ঐ বইগুলি উল্টেপাল্টে তাঁদের পড়তে দেবেন। এতে ফল নিশ্চয় হবে। কোনো একটি বই-এর লিখবার স্টাইল পাঠকের ভাল লেগে যাবে, যার ফলে তিনি ঐ বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'য়ে উঠবেন, উৎসাহিত বোধ ক'রবেন সেই বিষয়ে আরো জানবার জন্য। এমনি ক'রে পাঠকের রুচির ধারা লক্ষ্য ক'রে অবশেষে তাঁর রুচির পরিবর্তন বা বিবর্ধনও সম্ভব হবে।

কিন্তু পাঠকদের মন ফেরানো বা মন ভোলানো খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার মনের গড়ন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা দরকার। মানুষের স্বভাবই নিজেকে ত্রুটিহীন মনে করা। বুদ্ধি দিয়ে নিজের ভুল-ত্রুটির বিষয়ে সচেতন থাকা যে উচিত তা মানুষ মনে মনে জানে, কিন্তু কাজের সময়ে বড় একটা স্মরণ থাকে না। তাই একজনের স্বার্থের সঙ্গে আরেকজনের স্বার্থের সংঘাত লেগেই আছে। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তা বর্জন ক'রে গ্রন্থাগারের স্বার্থ দেখা। নিজের ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তি গঠনের কাজে লাগানো। তাই তাঁর উচিত পাঠকদের ব্যক্তিত্বকে আলাদাভাবে সম্মান করা,

তাঁদের ব্যক্তিসত্তাকে মেনে নিয়ে এবং মতামতের মর্যাদা দিয়ে কাজ সুরু করা। পাঠকদের বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শুনে, তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া। অর্থাৎ অপর পক্ষের যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শেষে একে একে নিজের যুক্তি দিয়ে তাঁদের মতের খণ্ডন বা সমর্থন করা। এর ফলে তাঁদের অহমিকাও খর্ব হয় না, আত্মসর্বস্বতাও প্রশ্রয় পায় না। বিরুদ্ধতা ক'রলে হয়তো তাঁদের একগুঁয়েমি আরো বেড়ে যেত, সংঘর্ষ বাধত এবং পরিণামে গ্রন্থাগারিকের বদনাম, ও গ্রন্থাগারের সুনামের হানি হ'ত। অথচ একটু ধৈর্যশীল বিবেচনার ফলে শুধু যে সব দিক বজায় রইল তাই নয়, একটি বিকৃত রুচি বা পথভ্রষ্ট প্রতিভা অনুশীলনের নূতন পথ পেল, সমাজের এবং দেশের হ'ল লাভ।

গ্রন্থাগারে পাঠকও আসেন বিভিন্ন মেজাজের। রকমারি রুচির। কেউ হয়তো সবজান্তার ভান করেন এবং পাণ্ডিত্য ফলাতে চান। এঁদের ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে নেই। বহ্বাস্ফোট মেনে নিয়ে শেষে তাঁদেরই নির্দেশিত বই এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন হ'লে আরো দু'চারটি প্রামাণ্য পুঁথি পাশাপাশি এনে ফেলে দিতে হয়,—যা'তে তাঁরা নিজেরাই নিজের ভুল শুধরে নিতে পারেন। এতে ভুলও ধরা পড়ে, অহমিকাতেও ঘা লাগে না—গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাও বেড়ে যায়। তাঁদের যদি সকলের সামনে ত্রুটি দেখান যেত তবে তাঁরা তো মর্মান্তিক চটতেনই, ভবিষ্যতেও কখনো তাঁদের ভাল কাজে পাওয়া যেত না। কোনো কোনো পাঠক আবার বদমেজাজী। পান থেকে চুণটি খসলে তাঁরা তোলপাড় করেন। এঁদের নিয়ে একটু অসুবিধা হয়, কারণ তাঁদের ধৈর্যেরও অভাব আর বোঝাতে গেলেও বিপদ। গ্রন্থাগার-কর্মী যদি তাঁর দিক থেকে কাজে কোনো ত্রুটি না রেখে, তাঁদের মন বুঝে চলেন তবে অনর্থক ভুল বোঝাবুঝিও হয় না এবং অপর পক্ষেও সৌজন্যবোধ আপনা থেকেই জেগে ওঠে।

আরেক ধরণের পাঠক আছেন যাঁরা অতিরিক্ত বিনয়ী বা লাজুক। এঁরা নিজের প্রয়োজনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন না এবং তাঁদের দরকারে অন্য কাউকে ব্যতিব্যস্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। অপর পক্ষ যে তাঁদের সাহায্য করতে আগ্রহশীল এবং তাঁদের সহায়তার জন্যই যে তাঁরা রয়েছেন সেটাও তাঁরা উপলব্ধি করেন এবং অপ্রয়োজনীয় কৃতজ্ঞতাবোধে বিনয়ে গ'লে যান। এই ধরণের পাঠক প্রায়ই নিজের প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন না ব'লে অনেক সময়ে প্রয়োজন না মিটলেও চলে যান, অনর্থক নিজের ক্ষতি করেন।

গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য হ'ল এঁদের এই লজ্জা ভেঙ্গে দেওয়া এবং তাঁরা কী চান তা কথায় কথায় বা'র ক'রে নেওয়া। এঁরা যে ঠিক কোন জিনিসটি চান বা কোন ধরনের বই পেলে তৃপ্ত হবেন তা তাঁরা নিজেরাও বোধহয় সঠিক জানেন না।

এক কথায় তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে পাঠকদের প্রবণতা কোন দিকে সেটা আবিষ্কার ক'রে নেওয়া গ্রন্থাগারিকের প্রধান কাজ। এই প্রবণতার মধ্য দিয়ে স্থানীয় পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রবণতার আভাসও পাওয়া যাবে। ফলে সমাজ-মনের একটি ছাপ গ্রন্থাগারিকের কাছে ফুটে উঠবে। তারপরে সমাজ এবং দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিদের প্রতি যথাযোগ্য নজর দেবেন তিনি।

এতক্ষণ যা বলা হ'ল তা গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে ভীতিকর বা বাড়াবাড়ি বোধ হবার আশঙ্কা থাকতে পারে। এ যেন একটা দেশ পরিচালনার মতো ব্যাপার। কথাটা কিন্তু অংশতঃ সত্য। এমনি খুচরো খুচরো পরিচালনারই সমষ্টি হল রাজ্য চালনা। গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে তাঁরা সর্বসাধারণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন। যে-কোনো ক্ষেত্রেই যদিও একথা খাটে, তবু কতকগুলি কাজ আছে যা আরো বেশি ক'রে সর্বজনীন। যেমন রেডিও, হাসপাতাল, পোস্ট-অফিস ইত্যাদি। এই সব প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে সাধারণের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং সকলেরই যেমন এগুলি থেকে ঠিকমত কাজ পাবার অধিকার আছে, তেমনি সর্ববিধ আগন্তুকদের খুসি করবার দায়িত্বও আছে এর কর্মীদের উপরে। তাই অন্যদের থেকে এই কর্মীদের একটু পৃথক ধরনের হ'তেই হবে। সাধারণকে যে সব কর্মী খুসি করতে পারেন না অথবা তাচ্ছিল্য করেন তাঁরা এই কাজের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নন। তৎপর ব্যবসায়ী যেমন ক্রেতারা দোকানে এলে তাঁদের মনোরঞ্জনের দিকে নজর দেন, এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও উচিত ঠিক সেইভাবে সকলের প্রতি আচরণ করা।

গ্রন্থাগারও ঐ জাতীয় একটি সংস্থা। উপরন্তু এর সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষা-সমস্যাটিও যুক্ত। সুতরাং সমাজ সেবার সঙ্গে সঙ্গে মানবমনেরও হদিস রাখতে হয় গ্রন্থাগারিককে। মানুষের চিন্তাবৃত্তিকে তিনি অবহেলা ক'রতে পারেন না। কাউকেই পারেন না হীন ব'লে ভাবতে। সেইজন্য গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের কাছে আমরা উন্নত ধরণের মনোবৃত্তি আশা করতে পারি। গ্রন্থাগারে মনঃসমীক্ষণের এই হল ভিত্তি।

জনসংযোগে গ্রন্থাগার

চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে স্বাধীন বিকাশেই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। এই চিন্তা বা মননশক্তি সুসমঞ্জস ধারায় এবং যুক্তিপরম্পরায় চালনা ক'রতে না পারলে বিভ্রম ঘটে। কোনো মানুষের একক চিন্তা কোনো বিশেষ রূপ নিতে পারে এবং সেই চিন্তনের সূত্র ধ'রে একাধিক মানুষ উপকৃত যেমন হ'তে পারে তেমনি আবার অপকৃতও হ'তে পারে। বহু যুগ ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হ'য়ে আসছে গ্রন্থসম্পদে। জ্ঞানার্জনের দু'টি পরস্পরসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার। কোন্ প্রতিষ্ঠান জনগণের কতটা উপকার করে এবং জনসাধারণের জীবনে কী ধরণের ছাপ রেখে যায় তার নির্ধারণ বা পরিমাপ কঠিন কাজ। মানুষী বিকাশে ব্যক্তি, পরিবেশ, গ্রন্থ প্রভৃতি নিজ নিজ ভূমিকায় নিঃশব্দে কাজ ক'রে যায়। শিশু প্রথমে ব্যক্তি ও পরিবেশ সচেতন হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে। তারপরে গ্রন্থপাঠে বিবিধ ব্যক্তি এবং নানাবিধ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। চিন্তা ও মননের সার্থকতা চরিত্র ও সমাজ গঠনে। বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পসরা-বিচিত্রায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানবর্ধন নিঃসন্দেহে সমাজের উন্নতি ও সুখ বিধান করে। আধুনিক মানুষের মননশীলতার মুক্তির ক্ষেত্র গণতান্ত্রিক বিকাশে। গণতন্ত্র সুষ্ঠু রূপ নিতে পারে শিক্ষিতের সমাবেশে। দেশের অশিক্ষা ও অজ্ঞান বিদূরণে গ্রন্থাগারের কর্মপরিধি ও কৃতিত্ব অন্যান্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ইংরেজি শিক্ষার স্পর্শে শিক্ষিত সমাজে নব মূল্যায়নের সচেতনতা এল, এবং বিশেষ ক'রে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন-সূত্রে মুক্তি সচেতনতা এল তখন থেকে দেখতে পাই দেশের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে। এই সব সংস্থার মধ্যমণি ছিল গ্রন্থাগার বা সাধারণ পাঠাগার। দেশের যুবশক্তি জাগ্রত হ'য়ে উঠতে পেরেছিল এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে,—নানাবিধ সংবাদপত্র এবং দেশবিদেশের ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠ ক'রে। আর এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশজোড়া অশিক্ষা দূর

করবার উদ্দেশ্যে সূত্রপাত হ'য়েছিল নৈশ-পাঠচক্রের—নানাবিধ বয়স্ক শিক্ষার প্রকল্প। গ্রামে গ্রামান্তরে হয়ত কোনো বিদ্যালয় ছিলনা, কিন্তু গ্রন্থাগার ছিল। আজ জেলায় জেলায় গ্রামে মহকুমায় সরকার পক্ষে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই কাজ এগিয়ে রেখেছে আমাদের এই সব বেসরকারী চাঁদা-ভিত্তিক ছোট বড় গ্রন্থাগার এবং এখনো পর্যন্ত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে বা মর্যাদায় ভাটা পড়েনি।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ যেমন অবসরবিনোদনের সহায়তা তেমনি অবসর সময়ের যথোপযুক্ত এবং উদ্দেশ্যমুখী ব্যবহার। সাধারণ জিজ্ঞাসু থেকে সুরু ক'রে বিশেষ গবেষকদের পর্যন্ত সাহায্য। আমেরিকার সেই চাষীর গল্পটা গ্রন্থাগার মহলে কারো অবিদিত নয়, যিনি ক্ষেত থেকে ফেরার পথে গ্রন্থাগারের জানালায় গলা বাড়িয়ে শুধিয়েছিলেন, ওহে বাপু, খুব তো পুঁথি-পত্তর সাজিয়ে বসেছ, আমার গরুটার যে মরণরোগ ধরেছে—কিছুতে চাঙ্গা হচ্ছে না—তার কোনো ওষুধ বাৎলাতে পারো? গ্রন্থাগারিক তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, আসুন, আসুন, চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি বৈকি। তারপরে চাষীর গরুটির অবস্থা জেনে নিয়ে বই-টই ঘেঁটে একটা নির্দেশ দিলেন। পরিণামে গরুটির রোগ নিরাময় হ'লে সেই চাষীই হয়ে উঠলেন গ্রন্থাগারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই ঘটনাটি থেকে বুঝতে পারা যায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্পদ কত বিচিত্রভাবে জনসাধারণের উপকারে লাগতে পারে এবং কত বিচিত্রভাবে, সহানুভূতির সঙ্গে গ্রন্থাগারিককে কর্তব্য ক'রে যেতে হয়।

বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক নিজ নিজ ক্ষেত্র বা প্রবণতা অনুযায়ী পাঠোপকরণ পেতে পারেন। গ্রন্থাগার মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীর,—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, সাধারণ—অর্থাৎ জনসাধারণের গ্রন্থাগার, এবং বিশেষ গ্রন্থাগার। এগুলির পাঠকগোষ্ঠীও সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য যা'তে শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষাক্রমের উপযোগী সহায়ক গ্রন্থাদি পান, বিশেষ গ্রন্থাগারে গবেষণাজাতীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি সংগৃহীত থাকে, আর সাধারণ গ্রন্থাগার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উপযোগী সব বিষয়ের বই রাখে। গ্রন্থাগারের প্রধান উপকরণ গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং প্রধান কাজ পাঠকদের কাছে সেগুলিকে হাজির করা। এই দু'টি কাজই আপাতদৃষ্টিতে বেশ সহজ সরল ঠেকে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এর

দুরূহতা বোঝা যায়। কোন গ্রন্থাগার কোন ধরণের গ্রন্থ সংগ্রহ করবে, এবং কোন শ্রেণীর পাঠকের কাছে কি ভাবে তা হাজির করবে? এর কি কোনো একটা সরলীকৃত নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, না কি শিক্ষাগত বা সামাজিক বা পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গাদি বিচারে তা বিচিত্র ধরণের হ'তে পারে? যেমন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ, কেন না, সেখানে শিক্ষকরা থাকেন পড়ুয়াদের নির্দেশ দেবার জন্য, এবং এমন সব বই সেখানে নির্বাচিত হয় যেগুলি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যপুস্তক অথবা তারই সহায়ক বই। প্রসঙ্গ বহির্ভূত যে সব বই রাখা সঙ্গত তাও স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। নির্বাচনের প্রধান দায়িত্বটা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য এই নির্বাচনাদির ব্যাপারে সহজ। তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যোগ-সূত্র হিসেবে কাজ করেন, পুস্তক সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করেন এবং কালোপযোগী গ্রন্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকেন। আরো যেসব তাঁর করণীয়, সে প্রসঙ্গ আমার এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে। বিশেষ গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্র যেমন সীমিত, তেমনি সমস্যাও ক্ষীণ। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের বেলায় সমস্ত দায়-দায়িত্বই গ্রন্থাগারিকের। তিনিই এখানে শিক্ষক—জনগণের পরোক্ষ শিক্ষক, নির্দেশক এবং সহায়ক। গ্রন্থনির্বাচন তো যান্ত্রিক উপায়ে হয় না,—মানুষেই ক'রে থাকে, এবং মানুষের প্রয়োজন বুঝেই ক'রে থাকে। সুতরাং মূল্যবোধের প্রতি সচেতন থাকতে হয়,—পুঁথিগত মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত, ব্যষ্টিগত ও সামাজিক মূল্যায়ন। গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক জনসমষ্টির পক্ষে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির বিচারে কোন্টা উপযুক্ত হবে সে বিষয়ে নজর খোলা রাখতে হয়, এবং পারিপার্শ্বিক সমাজের একটা জরীপ ক'রে নিয়ে ভাল-মন্দ প্রয়োজন-অপ্রয়োজন স্থির ক'রতে হয়।

গ্রন্থাগারে জনসাধারণের প্রবেশ যেমন অবারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি তার গ্রন্থসংগ্রহও পক্ষপাতমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কায়িক উপস্থিতির উপরে যেমন কোনো বিধি-নিষেধ জারি করা গর্হিত, তেমনি গ্রন্থগত চিন্তার সঞ্চয়নেও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ ক'রলে চলবে না। গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গি সর্ব-বিষয়াশ্রয়ী এবং উদার না হ'লে সাধারণের প্রতি অবিচার করা হয়। পুস্তক ও পাঠকদের প্রতি তিনি সমানভাবে দরদী হবেন, পাঠকদের সর্ববিধ সহায়তায় প্রস্তুত থাকবেন। তাঁর নিজস্ব মতামত ও বিচারবোধ তিনি অপরের উপরে

চাপাবার, অর্থাৎ গ্রন্থাগারের কোনো পাঠককে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করলে চলবে না। প্রধান বিচারক পাঠক। গ্রন্থাগারিক নির্বিচারে সর্বশ্রেণীর পুস্তক-সম্ভার গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ক'রবেন। কোনো মত বা পথের সপক্ষ বিপক্ষ, অনুকূল প্রতিকূল, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী—সকল ধরণের পুস্তকপাঠের স্বাধীনতা গ্রন্থাগারে অবারিত ভাবে থাকা উচিত। গণতন্ত্রের যুগে নিজ নিজ রুচি মতো বই বা পত্রিকা পড়বার স্বাধীনতা সকলের, মতামত গ'ড়ে তোলবার দায়িত্বও তাদের নিজস্ব। গ্রন্থাগারের কাজ মূকভাবে সব কিছু পাঠকের সামনে হাজির করা। গ্রন্থাগার হবে সর্ব-চিন্তাশ্রয়ী, মত-নিরপেক্ষ এবং প্রচার-বিমুখ। তার একমাত্র প্রচার নিজ গ্রন্থসম্ভার প্রতিটি নাগরিকের সামনে উপস্থাপনায়, সকলের চোখের সামনে সাজিয়ে রাখায়। এই ভাবে আন্তর্দেশিক এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং সমন্বয় সাধনের কাজ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অনায়াস হয়।

তবে কি পাঠকের রুচি-গঠনের কোনো দায়িত্বই গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের নেই? সমাজ-বিদ্বেষী এবং নীতি-বিরুদ্ধ বই-পত্রও কি নির্বিকার চিত্তে সকলের সামনে হাজির ক'রতে হবে? তা নিশ্চয়ই নয়। তা অবশ্যই নয়। এই সব ক্ষেত্রে খুব কায়দা ক'রে কাজ হাঁসিল করা দরকার। প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান কোনো পাঠককে সরাসরি কোনো উপদেশ বা নির্দেশ দেওয়া চলে না। তাতে তার ব্যক্তিত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। গ্রন্থাগারিক নীতিগত নীতিবিরুদ্ধ ভালমন্দ যাবতীয় বই পাঠকের কাছে পাশাপাশি তুলে ধ'রতে পারেন,—পরোক্ষভাবে তা'কে প্রভাবিত করবার এবং উদ্দেশ্যমত পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত করবার চেষ্টা ক'রতে পারেন। এইভাবে সূক্ষ্ম উপায়ে গ্রন্থাগারকে ক্রিয়াশীল ক'রে তুলতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত পুস্তকই অশ্রুত ভাষায় বলছে, আমার কথা শোন, আমার বক্তব্য অনুধাবন কর। সেই মৌন আহ্বানে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে যাতে সকলে সাড়া দিতে পারে সেই ধারাবাহিক ভাবে গ্রন্থগুলি পাঠকের হাতে তুলে দিতে হবে। পাঠক সেই থেকেই তার রুচিগঠন বা রুচিপরিবর্তনের নির্দেশ পাবে।

এখানে নিষিদ্ধ পুস্তক সম্পর্কে স্বভাবতই মনে কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে। গ্রন্থাগারের পক্ষে সব রকম বই রাখা যুক্তিযুক্ত হ'লেও সব বই-ই কি তিনি যে-কোনো পাঠকের হাতে তুলে দেবেন? দেওয়াটা সব সময়ে সমর্থনযোগ্য নয়, অথচ নৈতিক অভিভাবকত্ব গ্রন্থাগারিকের করবার কথা নয়। সুতরাং সব রকমের বই রাখলেও প'ড়বার বেলায় বাছাবাছি ক'রবেন কিনা সেইটাই বিবেচ্য।

সাধারণত দুই কারণে বই আইনত নিষিদ্ধ হ'তে পারে ; নীতি বিরুদ্ধ অশ্লীল বই এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিপন্থী পুস্তক। কিন্তু আইনত নিষিদ্ধ না হ'য়েও সমাজের পক্ষে অহিতকর অবাঞ্ছিত বইও থাকতে পারে। এ জাতীয় বই ক্ষতিকারক হবে কিনা তা পাঠকের মানসিক গঠন বা ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। এই ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণী মনোভঙ্গি এবং ক্ষমতা গ্রন্থাগারিককে আয়ত্ত করতে হয়। প্রধান বিবেচনা অপরিণত যুবচিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে কিনা সেদিকে নজর রাখা। কিন্তু কেবলমাত্র বই প'ড়ে কেউ অন্যায় কর্মে লিপ্ত হ'য়েছে এমন নজির বোধহয় নেই ; ঝোঁক আসে, কিন্তু তা বড় একটা দানা বেঁধে ওঠে না। বরঞ্চ উলটো নজির আছে, বই প'ড়ে ধরণ ধারণ বদলে গিয়েছে। যদিচ নীতি থেকে বিচ্যুতির প্রবণতা সহজ তবুও এর জন্য বই যত না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ। আমাদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং বেকার সমস্যা ছেলেদের মধ্যে নানান ধরণের শিথিলতা এনে দেয়। নীতি-শিথিলতার জন্য তাই কেবলমাত্র বইকে দায়ী করা ঠিক নয়। একেবারে শ্লীলতার লেশমাত্র নেই এবং সাজ্ঘাতিক রকমের দেশদ্রোহিতামূলক—এমন বই ছাড়া আর সব বই-ই বয়ঃপ্রাপ্ত পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। এবং অনেক চিন্তাশীল পাঠকই এমন এক জায়গায় এসে পৌছান যখন যে কোনো ধরণের পুস্তকপাঠেই তাঁর কোনো ক্ষতির বা বিকারের সম্ভাবনা থাকে না। পুস্তক নির্বাচনের এই সমস্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায় নেই, কেননা এ জাতীয় বই সেখানে সংগৃহীত হবার কোনো উপলক্ষ জোটে না ; যদি বা গবেষণা বা কোনো কারণে প্রয়োজন হয় তাহ'লেও সহজেই এ জাতীয় বই আলাদা ক'রে রেখে দেওয়া চলে,—সকলকে প'ড়তে দেবার বাধ্য-বাধকতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে এভাবে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। বরঞ্চ এক্ষেত্রে বিপরীতটাই হয়ত বা যুক্তিযুক্ত। যে-রুচি তিনি গঠন ক'রবেন, যে-মন তিনি মননশীল ক'রবেন এবং যে-সমাজ তিনি সংহত ক'রে তুলবেন তার হিত-অহিত দুই দিকই জনসাধারণের গোচরে এনে পাঠকসাধারণকে অবহিত ক'রবেন গ্রন্থাগারিক।

চিন্তাধারা' সজীব রাখবার কাজে গ্রন্থাগারের সজীবতা অপরিহার্য। দেশ ও কালের সঙ্গে তাল রেখে তার গ্রন্থসংগ্রহ গ'ড়ে তোলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যাকে ব'লেছেন "প্রতিস্থত চিন্তাধারার শুষ্কতা"—তা দেশ থেকে দূর ক'রতে না পারলে অশিক্ষা শাখায় প্রশাখায় ছড়াবে। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির গলদ হ'ল

জীবনের ধারা থেকে শিক্ষাধারার বিচ্ছিন্নতা, একটার সঙ্গে আরেকটা মিলে মিশে পরিপূরক হিসেবে চ'লতে চায় না। একদিকে যেমন শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার বাহাদুরী, অন্যদিকে তেমনি লেখাপড়ার সঙ্গে আড়াআড়ি। এর ফলে জাতির সংস্কৃতি ক্ষেত্রও যেন দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে যায়, এবং দেশের উন্নতি ও ঐক্য ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "শিক্ষা যদি···তলদেশে প্রবেশ না করে, ···তবে সমাজের উপরিভাগ যতই অবিশ্রান্ত নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।" শিক্ষাকে সমাজের সর্ব স্তরে বিস্তৃত করার কাজ একমাত্র গ্রন্থাগারই নিতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাক্রম এবং আওতা স্বভাবতই সীমিত। ঐ শিক্ষা সমাপ্ত ক'রবার পর যেমন নানাবিধ বিষয়ের জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য দরকার, তেমনি যারা প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসা গ্রন্থাগারের পক্ষেই সম্ভব। নিরক্ষরদের শিক্ষা এবং সদ্যসাক্ষরদের আপ্যায়নের দায়িত্ব গ্রন্থাগারই নিতে পারে। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে যাতে সাধারণ পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ হয়, অবসর বিনোদনে হালকা রচনা পাঠ সম্ভব হয়, এক পাঠ থেকে পাঠান্তরে যাবার আকর্ষণ পাঠকদের অনুপ্রাণিত ক'রতে পারে এবং তথ্যসম্ভারে ও তত্ত্ববিশ্লেষণে মূল্যমান গ'ড়ে উঠতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষাকেন্দ্রের গ্রন্থাগারগুলিতে ছাত্রদের শিক্ষাক্রমই প্রধান লক্ষ্য ব'লে কার্যক্রম বহুল পরিমাণে সীমিত,—যদিও ছাত্র-জীবনে সর্বগ্রাসী জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়—সাধারণত থাকেও। তবু সীমা মেনে চ'লতে হয়। সকলে এসব গ্রন্থাগারে প্রবেশলাভ ক'রতে পারে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে যেহেতু সমাজ-বিদ্যা ইত্যাদি শাখা থাকে এবং শিক্ষার্থীদের পরিপার্শ্ব-সচেতন করা উচিত হয় সেজন্য গ্রন্থাগারের কিছু পাঠাতিরিক্ত বা পাঠবহির্ভূত কার্যক্রম থাকতে পারে। বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন শাখায় যেমন গ্রামবাসীদের জন্য 'চলন্তিকা' নামে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে।

জনসংযোগে সাধারণ গ্রন্থাগারই ব্যাপকভাবে কাজ ক'রতে পারে। 'জনসংযোগ' কথাটি আমি দুই অর্থেই ব্যবহার করছি, জনসাধারণ যেখানে এসে মিলতে পারে এবং যে কেন্দ্র থেকে জনসাধারণের কাছে গিয়ে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা যেতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগার প্রধানত জ্ঞানভাণ্ডার, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উপযোগী পুস্তকের সংগ্রহশালা। এবং কার্যত

জনশিক্ষার সর্বাশ্রয়ী ও সহজ-সম্প্রসারণশীল কেন্দ্র। শিক্ষাপ্রসারের প্রধান লক্ষ্য,—অর্থাৎ শিক্ষার মূল কাজ সর্বসাধারণের মধ্যে একটা বিশেষ চেতনা আনা, চিন্তা, বোধ ও রুচিতে পরিবর্তন ও উন্নত ধারা প্রবর্তন, জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভ করানো, ভাবে ও সমঝদারিতে গভীরতা ও সচেনতার সৃষ্টি করা, এবং সর্বোপরি মূল্যবোধ, যুক্তি-বুদ্ধির মান এনে দেওয়া,—যে সব গুণের সমাবেশকে এক কথায় আমরা বলতে পারি, চরিত্রগঠন। সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা দ্বিবিধ, ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার কাজ ব্যক্তির সার্বিক উন্নতি বিধান, অর্থাৎ ব্যক্তির শিক্ষায় ও বিকাশে সহায়তার দ্বারা তাকে পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল ও সচেতন ক'রে তোলা। দ্বিতীয় বা মূল লক্ষ্য ব্যষ্টিগত বা সমাজগত,—এমন একটি সমাজ গ'ড়ে তোলা যেখানে পূর্বোক্ত সচেতন, চিন্তাশীল, দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবে, তথ্যাদির মননশীল সুষ্ঠু প্রয়োগে এবং তত্ত্বাদির কার্যকরী বিশ্লেষণে সমাজের প্রয়োজন মেটাবে। এই রকম সমাজ সমাবেশ নিয়েই দেশ। সুতরাং জনসংযোগের প্রধান ভিত্তি হবে, প্রথমত, যারা নিজ নিজ শিক্ষাধারা সম্বন্ধে সচেতন তাদের সহায়তা ; দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাগারটিকেই সর্ববিধ শিক্ষা বিকিরণের কেন্দ্র হিসেবে গ'ড়ে তোলা। কেবলমাত্র পাঠে সহায়তা করাই নয়, জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগারকে প্রসারিত ক'রে দিলে তবেই প্রকৃত জনসংযোগ সম্ভব।

জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জিজ্ঞাসু থাকে। প্রথমেই নাম করা যায় তাদের যারা বৃত্তিগত ভাবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত। তারা জানে কি ভাবে গ্রন্থসাহায্য নিতে হয় বা অপরকে দিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাদের নাম করা যায় যারা গ্রন্থাগার সম্পর্কে অবহিত এবং প্রয়োজনে সাহায্যপ্রার্থী, অপ্রয়োজনে কৌতূহলী পাঠক। তৃতীয়, উদ্দেশ্যসম্পন্ন ব্যবহারক, যা'রা বিশেষ কোনো পাঠক্রমাদির প্রয়োজনে গ্রন্থাগার ব্যবহার ক'রে থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে নাম করতে পারি তাদের যারা কালে-ভদ্রে গ্রন্থাগারে পদার্পণ ক'রে থাকে, এবং যারা গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই শেষ দুই শ্রেণী, বিশেষত শেষতম শ্রেণীর জন্যই জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তা। নানান উপায়ে তাদের গ্রন্থসচেতন ও গ্রন্থাগার-সচেতন ক'রে তুলতে হয়। তাদের মনের ক্ষুধা এবং জানবার তৃষ্ণা জাগাতে হয়। তাদের রুচির ধারা তৈরি ক'রে দিতে হয়। এজন্য ব্যক্তিক অভিক্ষেপণ দরকার,—জনসমাজের মধ্যে মিশে

গিয়ে তাদের বোধকে জাগ্রত ক'রে দিতে হয়। এই ভাবে গ্রন্থাগারকে বিস্তৃত ক'রে, প্রসারিত ক'রে সকলের সমক্ষে হাজির হ'তে হয় যাতে গ্রন্থাগার তাদের মতামত গঠনে, পোষণে ও ধারণে অবিসংবাদিত ও স্বাভাবিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হ'তে পারে। গ্রন্থাগারের আকার ছোট কি বড় তার উপরে এর প্রভাব বা ক্ষমতা নির্ভর করে না, যেমন জীবজগতে আকারের বৃহত্ব অপেক্ষা বেঁচে থাকবার বা বিবর্তিত হবার ক্ষমতার উপরে অথবা প্রাণসম্পদের উপরে জীবকূলের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আরেকটি বিষয়ও বিবেচ্য। আমরা আদর্শকে বিরাট রাখতে পারি, লক্ষ্য মহিমময় হ'তে পারে, কিন্তু এগোতে হয় ধাপে ধাপে, —ছোট ছোট সিঁড়ির উপরে পা ফেলে ফেলে,—বিশেষ থেকে ক্রমে নির্বিশেষে। সুতরাং চারপাশের কোনো কৌতূহল বা কোনো ঘটনাকেই উপেক্ষা করা উচিত নয়,—সম্ভবও নয় আজকের দিনে। সব কিছু জড়িয়ে সংহত হ'য়ে অগ্রসর হ'তে হয়। একেক মাটিতে যেমন একেক ধরণের বাড়ি তৈরি করতে হয়, নদীর চরিত্র অনুযায়ী যেমন সেতুর বিভিন্নতা,—কোনোটাই এক ছাঁচে খাড়া করা যায় না,—তেমনি গ্রন্থাগারের বেলায়ও গ্রন্থাগারিককে লক্ষ্য রাখতে হবে কেমন তাঁর ক্ষেত্র, কী তাঁর লক্ষ্য এবং কেমন হবে তাঁর পদ্ধতি।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সাম্প্রতিকতার ধারা বজায় রাখা দরকার যাতে আধুনিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠক পরিচিত হ'তে পারে। বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে সেই বিষয় সংক্রান্ত বই-এর প্রদর্শনী এবং তালিকা ইত্যাদি তৈরি ক'রে সকলের চোখের সামনে তুলে ধ'রতে হয়। এ ব্যাপারে পুস্তক অথবা মলাটগুলি যাতে সকলের চোখে পড়ে এমন জায়গায় সাজিয়ে রাখলে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট এবং কৌতূহল জাগ্রত হ'তে পারে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনীষীর শতবার্ষিক উৎসব হ'য়ে গেল, কিম্বা চীন বা পাকিস্তানের আগ্রাসী আক্রমণ, অথবা আগত মহাত্মা গান্ধীর শতবার্ষিকী,— এই সব উপলক্ষ্য কেন্দ্র ক'রে যাবতীয় তথ্যাদি বা গ্রন্থাদির প্রদর্শনী করা এবং ছবিতে, মানচিত্রে, নির্ঘণ্টাদি প্রস্তুত ক'রে যাতে সহজেই সাধারণের গোচরে আসতে পারে তা'র আয়োজন করা দরকার। এইভাবে গ্রন্থাগার জনসাধারণের যথাসম্ভব কাজে লাগতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বক্তৃতাদির আয়োজন এবং স্থিরচিত্র চলচ্চিত্রাদির প্রদর্শনে আরো বেশি কাজ হয়,—পাঠবিমুখ বা অশিক্ষিতেরাও জ্ঞানলাভ ক'রতে পারে। নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য, চাষবাস প্রভৃতি

বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের চিত্রপ্রদর্শনাদির ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই কার্যকর ভাবে হওয়া সম্ভব। গ্রামে গ্রামে যাতে বই প'ড়ে বা চিত্র দেখে জনগণ উপকৃত হ'তে পারে সেজন্য সাধারণ গ্রন্থাগার তরফে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখা দরকার। যারা দূরত্ব বা কর্মব্যস্ততা বা অন্য কোনো কারণে গ্রন্থাগারে আসে না বা আসতে পারে না তাদের বঞ্চিত রাখা গণতন্ত্রের যুগে অভাবনীয়। সুতরাং গ্রন্থাগারকে এইসব বঞ্চিতদের দুয়ারে দুয়ারে নিয়ে গিয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি এবং দেশের প্রতি কর্তব্য ক'রবেন এইটাই স্বাভাবিক।

সাধারণ গ্রন্থাগার ইচ্ছা ক'রলে এর বেশিও ক'রতে পারে। সামাজিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে গৃহপরিবেশও মনোরম হ'লে রুচি গঠনে ও বিকাশে সহায়তা করে। সাধারণ গৃহস্থঘরের পরিচ্ছন্নতার অনুকূল গৃহসজ্জার দিকে কিছু নজর দেওয়া দরকার। গৃহপরিবেশ মনোরম হ'লে সাংসারিক গ্লানি কেটে যায়, মন প্রফুল্ল হয়, প্রেরণা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত বিকাশ সহজ হয়। আমাদের দেশে এই দিকে নজর সব পরিবারেই অল্প-বিস্তর থাকে। ঘরের মেয়েরা নানাবিধ সেলাই-ফোঁড়াই দিয়ে আসবাব সজ্জিত করে, পালে-পার্বনে আলপনা দেয়, ফুল নিয়ে মালা গাঁথে। কিন্তু গান বা ছবির দিকে অর্থাভাববশত বড় একটা নজর দিতে পারে না। ছবির কাজটা ক্যালেণ্ডারই চালিয়ে দেয়। অনেকে গ্রামাফোন একটা কোনো ক্রমে কিনে থাকে, কিন্তু নিয়মিত বা ইচ্ছামত রেকর্ড কিনে উঠতে পারে না। জন-সাধারণের গ্রন্থাগার এসব দিকেও সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে। গ্রন্থাগারে গান শুনবার জন্য যেমন একটি আলাদা ঘর রাখা যেতে পারে তেমনি সামান্য চাঁদার বিনিময়ে গানের রেকর্ডও বই-এর মত ধার দেওয়া যেতে পারে। খ্যাতিমান শিল্পীদের বাঁধানো ছবির সঞ্চয় রেখে অনুরূপ ভাবে সেগুলিও গ্রন্থাগার ধার দিতে পারে। তাতে সামান্য অবস্থার লোকেরাও চিত্রশিল্পের আস্বাদ পেতে পারে। এই ভাবে গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলতে পারে জনরুচি।

জনসংযোগের কাজে আজকাল রেডিয়ো বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছে। মনে হ'তে পারে, বেতারবার্তা শুনেই তো লোকের তথ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান হ'য়ে যায়, তাহ'লে আর বক্তৃতা, প্রদর্শনী, এসবের কী দরকার,—ঘরে ঘরে রেডিয়ো থাকলেই দূর থেকে জনসংযোগের কাজ চালানো যায়। কিন্তু রেডিয়োর কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন এ জাতীয় প্রত্যেক প্রচার-মাধ্যমই ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ।

বেতারযোগে কেবলমাত্র বক্তৃতা, সংবাদ, সংগীত ইত্যাদি পরিবেষিত হ'তে পারে —যার ফলে জ্ঞানতৃষ্ণার আংশিক নিবৃত্তিই সম্ভব। রেডিয়ো একতরফা অনুষ্ঠানের ব্যাপার, সাধারণ লোকে কী চায়, কী ভাবে, তা বহুলাংশেই কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে পারেন না, তাদের চাহিদা মেটাতে পারেন না। জনগণের সঙ্গে মিশে তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বুঝে দেখবার মতো কোনো আয়োজন তাঁদের নেই। দেখা যায়, তাঁদের কতকগুলো নিজস্ব নীতি বা পছন্দ আছে, তারই মাপকাঠিতে জনগণকে তাঁরা বিচার করেন। তাই রেডিয়োর ক্রিয়াক্ষেত্র স্বভাবতই সীমিত। বেতার মাধ্যমে শুধু শুনে যেতে হবে, প্রশ্ন ক'রে জেনে নেবার উপায় নেই,—চিঠি মারফত জেনে নেবার ব্যবস্থা থাকলেও তার সঞ্চালন একতরফা। তাছাড়া, সপক্ষ বিপক্ষ সব রকম চিন্তা বা তথ্যাদি পরিবেষণও বেতার মারফত হয় না, ফলে এটি এক ধরণের প্রচারযন্ত্র হ'য়ে ওঠে। উদ্দেশ্যমূলক কোনো বিষয়ই পরিণামে ফলপ্রসূ হয় না। জনসংযোগে অদৃশ্য মানবকণ্ঠের বদলে মানুষের কায়িক উপস্থিতি অধিকতর কার্যকর এবং আনন্দদায়ক। ব্যক্তিক অভিক্ষেপণের ফলে কৃত্রিমতা বা আন্তরিকতা সহজেই জনমনে ধরা পড়ে, এবং এই উপায়ে তাদেরই একজন হ'য়ে মিশে গিয়ে কাজ ক'রে যাওয়া সম্ভব হয়। চলচ্চিত্র বা বিবিধ প্রদর্শনাদির মাধ্যমে জ্ঞান লাভের ব্যাপারটা সহজতর, স্বল্পায়াসে জনগণের রুচিগঠন এবং রুচির ধারায় পরিবর্তন আনা যায়। টেলিভিশনের প্রচার এবং প্রসার যদি বাড়ে তাহলে শ্রুতির সঙ্গে চাক্ষুষ দৃষ্টির মিলন হবে এবং অনেকাংশে চিত্রসংবলিত তথ্য পরিবেশনের কাজ তার মাধ্যমে সম্ভব হবে। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা তার অনুকূল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ধনীদের বিলাস সামগ্রী হিসেবে গণ্য না হ'য়ে জনসাধারণের দুয়ারে প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে আসতে তার এক যুগ কেটে যাবে। রেডিয়ো প্রভৃতি আর পাঁচটা জিনিসই বা এমন কী সস্তা হয়েছে যার ফলে সকলের অধিগম্য হ'তে পেরেছে? তবে এসব সামগ্রী যতই কেন না জনসংযোগের কাজ ক'রতে চেষ্টা করুক, আর সভ্যতা এবং গণতন্ত্রের অপরিহার্য দূত হিসেবে সংবাদপত্রও যতই কেন না দুয়ারে দুয়ারে হাজির হোক, পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের দিকটা থেকেই যাবে, মিটবে না। জনসংযোগের সেই অভাব মিটিয়ে সব দিক বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে সুপরিকল্পিত পথে এগিয়ে যাওয়া একমাত্র গ্রন্থাগারের পক্ষেই সম্ভব।

গ্রন্থাগারে কর্মীসহযোগ

গ্রন্থাগার এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রত্যেক কর্মী পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে মিলে মিশে কাজ না করলে কাজকর্ম যেমন মসৃনভাবে চ'লবেনা তেমনি এর উদ্দেশ্যও সার্থক হবেনা। একথা অবশ্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই সত্য। আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই উচ্চপদে আসীন মুষ্টিমেয় কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাঁদের নির্দেশ, বিচার বা খেয়াল মতোই কাজ চলে। এমনকি কার্যনির্বাহের জন্য যেখানে সমিতি বা কমিটি আছে—আজকাল যার বহুলতা সরকারী বেসরকারী সব সংস্থাতেই দেখা যায়—সেখানে সেটি শুধু নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে থাকে। আসল কাজ যাঁর বা যাঁদের চালাবার তাঁরাই চালান এবং তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে নেন। এর মধ্যে দোষের কিছু থাকেনা যদি কর্মীদের সবাইকে নিয়ে তাঁদেরও মতামতের মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব ভাগাভাগি ক'রে কাজ চালানো হয় এবং প্রতিষ্ঠানটিকে যাতে সকলেই তাঁর নিজের ব'লে ভাবতে পারেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এইটিই যৌথ পরিচালনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু গণতন্ত্রের মস্তবড় অবদান নির্বাচন বা ভোট, এবং ভোট-রঙ্গের কথা কে না জানেন। ভোট সংগ্রহ ক'রে নিজের কোলে ঝোল টানা রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সংস্থা ও দপ্তরনীতির সহজতম প্রাথমিক অধ্যায়। এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে প্রত্যেক দপ্তরে বা প্রতিষ্ঠানে দুই বা বহু ভাগে কর্মীদল বিভক্ত হ'য়ে পড়েন, কাজ ক'রে যান দায়-সারা গোছের, প্রতিষ্ঠানকে নিজের ব'লে ভাবতে পারেননা,—সেরকম শিক্ষা বা প্রেরণা পান না। কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়ে, শীলধর্ম বা সদাচারের পাঠ দিয়ে সে ভাব আনা যায় না। তার জন্য সকলকে নিয়ে সকলের আস্থা অর্জন ক'রে যেভাবে কাজ ক'রে যাওয়া উচিত তার অভাব সর্বত্রই দেখা যায়। ফলে দেশসেবী দেশকে নিজের বা কাজকে দেশের ব'লে মনে করেন না, সরকারী কর্মচারী মনে ক'রতে পারেননা দেশ আমার নিজের, ব্যবসায়ী ভাবতে পারেননা দেশের দশজনা তাঁরই নিজের লোক। ইংরেজ আমলে সরকার বিদেশী ছিল ব'লে তারা যেমন দেশকে নিজের ব'লে ভাবেনি, আমরাও তেমনি ভেবেছি যা পারা যায় লুটে পুটে নেওয়া যাক। এবং সেই লুণ্ঠনের ভাব এখনো মন থেকে যায়নি।

কিন্তু এ হ'ল ধান ভানতে শিবের গীত। আমি দেশজোড়া শিথিলতার সমালোচনা ক'রতে বসিনি। ব'লতে ব'সেছি গ্রন্থাগারে কর্মীসহযোগের কথা। প্রথমেই ব'লেছি, গ্রন্থাগারের কাজ মসৃনভাবে চালাতে এবং উদ্দেশ্য সফল ক'রতে সকল কর্মীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ব'ললে কি বোঝায়? এক কথায় আমরা ব'লতে পারি, বিশেষ বা সাধারণ যে কোনো গ্রন্থগারেরই উদ্দেশ্য শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রচারে-প্রসারে এবং সংস্কৃতি ও রুচির গঠনে-ধারণে সহায়তা করা। সেজন্য গ্রন্থাগারের প্রতিটি কর্মী যদি বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ন না হন তা'হলে কাজের সঙ্ঘবদ্ধতায় অন্তরায় সৃষ্টি হবে। অপরদিকে গ্রন্থাগারিক যদি সহযোগিতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হন তাহ'লেও কাজের বিঘ্ন ঘটবে। পারস্পরিক এই সহযোগিতার বিষয়টিকে কয়েকটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। যেমন, কর্মীসহযোগে কর্মীদের উপরে কী ধরণের প্রভাব পড়ে, গ্রন্থাগারিকের উপরে এর ক্রিয়া কি রকম এবং সেই সূত্রে গ্রন্থাগার-পরিচালকমণ্ডলীর উপরে তার প্রভাব, গ্রন্থাগারের উন্নতির বাপারে এর অবদান কোন ধরণের, এবং সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার-কর্মীদের শিক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে—সেই সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ বা কর্মীসম্মেলনের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য কিছু আছে কিনা।

কর্মীসহযোগের ব্যাপারে গ্রন্থাগার-কর্মীদের উপরে এর প্রভাব সর্বাধিক সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। 'সহযোগ' ও 'প্রভাব' ব'লতে বুঝি তাঁদের কাজের জ্ঞানগত উৎসাহ এবং প্রয়োগজনিত অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদান। গ্রন্থাগারের কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন তা আমরা জানি। এই বিশেষ শিক্ষা যে যে কেন্দ্রে হয় সেগুলিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়না। কেবলমাত্র বর্গীকরণ এবং সূচীকরণের বিষয়ে কিছু পরিমাণ হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের যদি চালু গ্রন্থাগারের নানাবিধ বিভাগে কিছুটা ক'রে চাকুরি-বিকল্প বা নিয়োগানুবর্তী শিক্ষা (n-service training) গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে গ্রন্থাগার-জগতে কর্মী হিসেবে প্রবেশের পূর্বেই তাঁরা কাজ সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল হ'য়ে আসতে পারেন। এই সূত্রে ব'লতে পারি, শিক্ষাক্রমের মধ্যে যদি সমস্যা সাজিয়ে পরিচালনার ভূয়া-প্রকল্পের (arranged case studies) ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হ'তে পারে। এমনকি তিন দিনের পাঠক্রম ঐ একটি দিনের ভূয়া-পরিচালনায় রপ্ত হ'য়ে যেতে পারে। বিষয়টা

পরিষ্কারভাবে বোঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, গ্রন্থাগারের কার্য-নির্বাহক সমিতি কিভাবে কাজ ক'রবে তা বোঝাবার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সমিতি বা কমিটি খাড়া করা হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যদি বিষয় হয় তবে কেউ উপাচার্য হিসেবে রইলেন, কেউ গ্রন্থাগারিক, কেউ কেউ বা বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষ হিসেবে। সমিতির কর্মসূচী খাড়া ক'রে উপস্থাপন করা হ'ল এবং আলোচনার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এই ভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মহড়া চালিয়ে প্রকৃত কাজের একটা আন্দাজ শিক্ষার্থীরা পেতে পারেন।

গ্রন্থাগারের কর্মীরা যদি গ্রন্থাগারে সামগ্রিক কাজ-কর্ম ভাল-মন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন তবে গ্রন্থাগারের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি ক্ষতি কর্মীদেরও। একথা সত্য যে প্রতিটি কর্মীকে কোনো বিশেষ ধরনের কাজে লাগতে বা লাগাতে হয়। কেউ বা সূচীকরণের কাজে লিপ্ত থাকেন, কেউ বা বর্গীকরণের, কেউ ক্রীত পুস্তকের তালিকা প্রণয়নে, কেউ লেন-দেনের ব্যাপারে। কিন্তু এই সব কাজই একটি সূত্রে বাঁধা, একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই কারো পক্ষে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করা সম্ভবও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। সকলে মিলে একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চ'লতে হয়। সেই লক্ষ্য জ্ঞানের সীমা বিস্তারের সীমান্তে প্রসারিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই এ বিষয়ে শৈথিল্য দেখা যায়। এই শৈথিল্যের জন্য সর্বাংশে কর্মীরা দায়ী নন। পরিবেশ অনুকূল না হ'লে তাঁদের পক্ষে কিছু ক'রে ওঠা বা গ'ড়ে তোলা দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। শেষে একটা গা-ছাড়া ভাব আসে—চাকরি ক'রছি তাই যেটুকু না ক'রলে নয় ক'রে খালাস হই। এই ভাব আসবার জন্য আমাদের অব্যবহিত এবং চূড়ান্ত কর্তাব্যক্তিরা কম পরিমাণে দায়ী নন। প্রথমেই ব'লতে হয় গ্রন্থাগারকর্মীদের চাকুরিগত শোচনীয় অবস্থার কথা। তাঁদের বেতনের এবং পদ-গৌরবের যে অবস্থা ক'রে রাখা হ'য়েছে তাতে তাঁদের কাছ থেকে উচ্চাদর্শময় দৃষ্টিভঙ্গির আশা করা যায় না। বিশেষতঃ আজকের বাস্তব পরিবেশে যেখানে সপরিবার জীবন-রক্ষার জন্য নাজেহাল হ'তে হয়। জীবনযাপনের মানের উপর জীবনাদর্শের মান নির্ভর করে সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগারকর্মীর কাজ শিক্ষা এবং জ্ঞানের সঙ্গে এমন-ভাবে জড়িত যে তাঁরা সমাজের বিশিষ্ট স্থান দখল ক'রবার আশা ক'রতে পারেন। অথচ কার্যক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা সাধারণ কেরানীদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞান নেবার পরেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ গ্রহণ ক'রে এসে যখন কর্মস্থলে নামেন তখন দেখেন তাঁদেরই সঙ্গে তুলনীয় সম-গোত্রীয় শিক্ষাবিদ অথবা দপ্তরবিদদের সঙ্গে তাঁদের বেতন ও মর্যাদার দুস্তর বিভেদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জুরী আয়োগ সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের সম-মর্যাদায় বেতনের সমবণ্টনের দিকে নজর দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রস্তাবিত ক্রমের মধ্যে যেমন ফাঁক আছে তার চেয়েও বেশি ফাঁক লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁরা এই বেতনক্রম এবং পদ-মর্যাদার সর্বাংশ প্রয়োগে অনিচ্ছুক বা উদাসীন। এবং দুঃখের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তাঁরা এ বিষয়ের কোনো ফয়সালা করেননি। মনে হয়, শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মীদের একই দৃষ্টিতে দেখতে তাঁরা চান না এবং এমন মনে করাও অস্বাভাবিক নয় যে আমাদের কর্তৃস্থানীয় বহু গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা গ্রন্থাগারের কাজ সম্পর্কে—এর বিশেষ স্থান এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্পর্কে—কোনো ধারণাই রাখেন না। গ্রন্থাগার যে শিক্ষা ব্যাপারে কত দিক দিয়ে কত রকম ভাবে সাহায্য ক'রতে পারে এবং শিক্ষণের পরিপূরক হিসেবে শিক্ষকদের কাজ লাঘব ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা ক'রতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের যদি চিন্তার দৈন্য ও ধারণার অভাব থাকে তাহ'লে এর চেয়ে দুঃখজনক ও ক্ষতিকারক আর কি হ'তে পারে?

দেশজোড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ঐ একই অবস্থা দেখা যায়। আজকাল 'পরিসংখ্যান' নামে একটি হাতিয়ার সরকার তরফে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। তদ্দৃষ্টে মনে হ'তে পারে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগারের ক্রিয়াকর্মের ব্যাপ্তিতে জনগণের মধ্যে পড়ুয়া হবার জন্য সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। কিন্তু সন্ধানীরা জানেন অবস্থাটা কেমন। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার যদি বা আছে তো পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে ঢিমে তাল চ'লেছে, গ্রন্থাগারিক যদি বা আছেন তো তাঁর স্বাধীনতা বা স্বাধীন চিন্তাবিকাশের বা কর্মপন্থা গ্রহণের ক্ষেত্র নেই। জেলাশাসক মণ্ডলী সেখানে প্রধান এবং পরামর্শদাতা, গ্রন্থাগারিক অনেকাংশে নিমিত্তের ভাগী মাত্র। এই অবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীর নূতন ভাবধারার প্রয়োগের সুযোগ বা কর্মে উৎসাহ আসে না। এই সব গ্রন্থাগার সমাজ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যে সব সমাজ-শিক্ষাবিদ কর্ণধার হিসেবে থাকেন তাঁরাও নির্লিপ্ত বা নিরাসক্ত ভাবেই অবস্থান করেন। সরকার নির্ধারিত

সাম্প্রতিক বেতনক্রমও গ্রন্থাগার কর্মীকে উৎসাহিত বা মর্যাদাবান করবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

এসব অবশ্য আমার প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। কর্মীসহযোগের পটভূমি হিসেবে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সে যাই হোক, আশা করব এই অবস্থার উন্নতি অদূর ভবিষ্যতে হবে। এখন আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কর্মীদের অনুকূল স্বচ্ছন্দ পরিবেশ রচনায় গ্রন্থাগারিকের দায়-দায়িত্ব অনেক,—ব'লতে গেলে সবটাই। গ্রন্থাগারিক এর ভালোয় মন্দয় প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। কেননা, এই কর্মীসহযোগের প্রবর্তন যেমন তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব তেমনি এর ফলাফলের ভাগীও মূলতঃ তিনিই। তাঁর কাজের সুসমঞ্জস বণ্টনের সুফল যেমন তিনি এবং গ্রন্থাগার ভোগ করেন তেমনি এর কুফলের প্রধান দায়িত্বও তাঁর। কিন্তু তিনি এজন্য তাঁর নিজস্ব মতের সপক্ষে সকলকে পরিচালিত ক'রতে এবং দ্বিমতকারী মাত্রেরই প্রতি বিরূপ হ'তে পারেন না। গ্রন্থাগারিক যেমন পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থাগারের নীতি নির্ধারণ করেন, তেমনি তাঁর পক্ষে বিভাগীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক বসিয়ে আলোচনার দ্বারা সেই নীতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। তেমনি গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিভাগ উপ-বিভাগের সুবিধা অসুবিধার কথা এবং উন্নয়নমূলক নীতি প্রবর্তনের বিষয় নিয়ে নিজ কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা ঠিক ক'রে নিয়ে তারপর সেটি পরিচালকমণ্ডলীর কাছে পেশ করা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে প্রতিটি কর্মী তাঁর নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে এবং সমগ্রভাবে গ্রন্থাগারের কাজ সম্পর্কে সচেতন হবার প্রেরণা পাবেন, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন ক'রে যৌথ দায়িত্বের ভার বহন ক'রতে পারবেন। গ্রন্থাগার পরিচালনার খুঁটিনাটির মধ্যে কর্মীরা যদি এইভাবে না যেতে পারেন তাহলে ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারিক তৈরির পথ খোলা থাকে না। বড় গ্রন্থাগারে কাজ ক'রে তাঁরা সংগঠন ও পরিচালনার শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য ছোট বড় গ্রন্থাগারের পরিচালক হবার যোগ্যতা অর্জন ক'রবেন এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় গ্রন্থাগারিক অথবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মীরা সব কাজের চাবিকাঠি নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে সমস্ত শক্তির একীভূত আধার হয়ে থাকতে চান। শুধু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান, আয়োগ, সংস্থা, দপ্তর ইত্যাদির বেলায় লক্ষ্য করা যায় পরিকল্পনা বা দায়িত্ব সবই যিনি প্রধান তিনি নিজের কব্জার মধ্যে রাখেন, সব কিছুকেই একটা গোপনীয়তার মোড়কে রেখে সর্বশক্তিমান হ'য়ে

ব'সে থাকতে চান। এর ফলে তাঁর অতি মূল্যবান পদটি যখন খালি হয় তখন উপযুক্ত লোকের জন্য চারিদিক হাতড়ে বেড়াতে হয়, কেননা তিনি কাউকে বিশ্বাস ক'রে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন নি,—কাউকে ওয়ারিশ হিসেবে তৈরী ক'রে যান নি। এই মনোভাবের ফলে কর্মীরা বরাবর অসন্তোষের মধ্যে দিন কাটান এবং অনিচ্ছুক ভাবে কাজ ক'রে যান,—পুরো শক্তি নিয়োগ ক'রতে নারাজ থাকেন,—যার ফলে তাঁদের ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয় এবং গ্রন্থাগারেরও উন্নতির পথে ব্যাঘাত ঘটে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রলেই দেখা যাবে এই রোগ আমাদের সমগ্র দেশকে কি ভাবে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, সৃষ্টি ক'রেছে নানান দলের এবং অসুস্থ পদ্ধতির। নিজ নিজ স্বার্থ চিন্তায় এবং শুধুমাত্র নিজের উন্নতির রাস্তা খোলা রাখবার জন্য আমাদের অধিকাংশ কর্তাব্যক্তিরাই নিম্নতন কর্মীদের স্বীকৃতি দিতে নারাজ থাকেন এবং তাঁদের প্রকাশের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ান। অথচ সহজ সত্য এই যে, নিজের বিভাগে গুণী এবং অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল কর্মী থাকলে তাঁর নিজ অধ্যক্ষতার সুনাম এবং প্রতিষ্ঠানেরই গৌরব বাড়ে, এবং মিলেমিশে পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কাজ ক'রলে পরিচালক হিসেবে তাঁরই বিশেষত্ব ও সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

কর্মীসহযোগ চর্চার আরেকটি ক্ষেত্র গ্রন্থাগার পরিষদ। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীরা নানান সংস্থায় মিলিত হ'তে পারেন। আমাদের মধ্যে যেমন আছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন, প্রভৃতি,—এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও অনুসন্ধান গ্রন্থাগার পরিষদ (IASLIC) ইত্যাদি জাতীয় বিশেষ সংস্থা। এই জাতীয় পরিষদের কাজ যেমন আলোচনা সভা বা পত্রিকাদি বা'র করা তেমনি গ্রন্থাগার সমস্যা নিয়ে আন্দোলন ও পরিকল্পনা পেশ ক'রে দেশের সরকারকে ও জনগণকে সচেতন ক'রে তোলা। যেমন, বেতনক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারী বেতন কমিশনের বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি রূপায়িত হ'ল কিনা সে বিষয়ে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, ইত্যাদি, কিন্তু আরো অভ্যন্তরে দৃষ্টি বিস্তার ক'রে দেখা দরকার ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত সিদ্ধান্ত নীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হ'য়ে থাকলেও কর্মীনির্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত বেতনক্রম দেওয়া হ'চ্ছে কিনা অথবা দায়সারা ভাবে বেতনক্রমের নিয়ম রক্ষা হলেও সমবণ্টন হ'চ্ছে কিনা, ইত্যাদি। কর্মীকুলের সচেতনতাই এইসব ব্যাপারে পরিষদের সহায়ক হ'তে পারে। গ্রন্থাগারকর্মীরা

পরিষদ মারফত যেমন নানান গ্রন্থনা গবেষণার কাজ হাতে নিতে পারেন তেমনি এখানে নিজেদের কাজকর্ম সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার আলোচনা ক'রে সমাধানের পথ খুঁজে বা'র ক'রতে পারেন। এভাবে পারস্পরিক সহযোগ রক্ষা ক'রে নিজেদের দায় নিজেদের কাঁধে তুলে না নিলে ব্যক্তিগত বা সামগ্রিক উন্নতির সম্ভাবনা সাম্প্রতিক পরিবেশে দূরপরাহত হবে। গ্রন্থাগার পরিষদকে ট্রেড য়ুনিয়ন জাতীয় সংস্থা মনে ক'রবার কোনো হেতু নেই। তবু কর্মী হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধতা প্রয়োজন। কর্মীরা নিজ নিজ গ্রন্থাগারে নানান বিধিতে অথবা নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। সেখানে তাঁদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিষদগুলিতে তাঁদের সেই বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক থাকে না। এখানে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র সত্তা এবং চিন্তার বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। তাই পরিষদের গ্রন্থাগার মাধ্যমে এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের সূত্রে কর্মীরা নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ ক'রতে পারেন। গ্রন্থাগারের বিবিধ সমস্যা নিয়ে এখানে যদি চাকুরি-বিকল্প বা ভূয়া-প্রকল্পের শিক্ষাচক্র বসানো যায় তাহ'লে প্রত্যেকেই তাতে অংশ গ্রহণ ক'রে উপকৃত হ'তে পারেন। পরিষদের এই ধরণের শিক্ষা-চক্রের সুযোগে তাঁরা গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে রপ্ত হ'তে পারেন। গ্রন্থাগার পরিষদ এই ভাবে কর্মীসহযোগ সূত্রাবলীর দিকে নজর দিলে নূতন নূতন পথের হদিস মিলতে পারে, কর্মীবৃন্দের মধ্যে উৎসাহ, কর্তব্যবোধ এবং কুশলতার সৃষ্টি হ'তে পারে।

গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধনশীল এবং ক্রমপরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠান। বছরের পর বছর জ্ঞানের ভাণ্ডার বেড়ে চলে, গ্রন্থসম্পদও বর্ধিত হয়। নূতন নূতন চিন্তাধারার প্রসার এবং কল্পনা ও পদ্ধতির প্রবর্তনে-বিবর্তনে নানাবিধ পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। জাগতিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের জোয়ার গ্রন্থাগারকে স্বভাবতঃই স্পর্শ করে, তার সঙ্গে তাল রেখে চ'লতে হয়। পুস্তকসম্পদ স্থিতিশীল, কিন্তু চিন্তাধারা বিচরণশীল। জ্ঞান সম্পদ এক মন থেকে আর এক মনে সঞ্চারিত হ'য়ে চলে। পুরানোকে সরিয়ে নূতন চিন্তাধারা অথবা পুরানোকে ভিত্তি ক'রে নব রূপায়ণ যুগ থেকে যুগে চ'লতেই থাকে। এই নিত্য নবীনতাকে বরণ ক'রে নিতে না পারলে পিছিয়ে প'ড়ে থাকতে হয়, থিতিয়ে যেতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানই চিরাচরিত প্রথাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পারে না,—থাকলে বাড়তে পারে না। গ্রন্থাগারিক অথবা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ

যদি নূতন নূতন ভাবধারাকে তুচ্ছ করেন তাহ'লে সেই গ্রন্থাগার মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণে লাগে না। এই নূতন চিন্তাধারা আসবে নূতন নূতন কর্মীদের কাছ থেকে। তাঁদের পরিকল্পনা পরামর্শকে যদি উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়া যায় তবে গ্রন্থাগার মৃত গ্রন্থাগার হ'য়ে পড়বে, গ্রন্থাগারিক যাবেন বিস্মৃতিগর্ভে তলিয়ে। গ্রন্থাগারে এই নবযৌবনের দলকে অগ্রাহ্য না ক'রে ছোট ছোট প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাজের সুযোগ তৈরি ক'রে দিলে এবং তাঁদের মতকে রূপায়িত ক'রবার ঝুঁকি নিলে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, এবং এই সহযোগিতায় কর্মীরাও উৎসাহিত বোধ ক'রবেন। হয়ত ছোটখাট ভুল ত্রুটি প্রথম প্রথম দেখা যাবে,—তা আর কোথায় কবে না হ'য়ে থাকে,—কিন্তু গ্রন্থাগারিক তাঁর অভিজ্ঞতার হাল ধ'রে তাঁদের পরিচালিত ক'রবেন। এইভাবে ভবিষ্যৎ পরিচালক এবং চিন্তানায়ক তৈরি হবে, গ্রন্থাগার-কর্মীদের কাজ ছন্দময় বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠবে, গ্রন্থাগারের প্রাণগঙ্গা থাকবে চিরপ্রবহমান।

জীবিকা হিসেবে যাঁরা গ্রন্থাগারের কাজকে বেছে নেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিছক চাকরির প্রয়োজনেই এদিকে ঝোঁকেন সন্দেহ নেই। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই। তবে আমরা দেখতে পাই গ্রন্থাগারকর্মের দিকে সাধারণতঃ খুব কৃতী ছাত্রছাত্রীরা ঝোঁকেন না, খুব কম ব্যক্তিই আদর্শের প্রেরণায় আসেন। তার মধ্যেও আবার অনেকেই গ্রন্থাগার জগৎ থেকে স'রে শিক্ষাজগতে বা অন্য উপজীবিকার ক্ষেত্রে চ'লে যান। তবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, হরিনাথ দের মতো মনীষীরা একদা গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছেন, এবং রঙ্গনাথন আজ এবিষয়ে ভারতের গৌরব,—বিশ্বের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এক সারিতে তাঁর নাম। জীবিকার ক্ষেত্রে অনেককেই অনেক কাজে বাধ্য হ'য়ে ব্রতী হ'তে হয়, কিন্তু মনীষার ক্ষেত্রে তাঁরা পিছিয়ে থাকেন না। গ্রন্থাগার-জীবিকার আকর্ষণহীনতার জন্য কর্মীরা দায়ী নন। বরঞ্চ তাঁদের মধ্য থেকেই নূতন নূতন চিন্তাশীলের আবির্ভাব ঘটে। গ্রন্থাগারের কাজকে স্বীকৃতি দেবার জন্য সরকারপক্ষের গরজ বড় একটা নেই, এবং কৃতীদের আকর্ষণ ক'রবার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই এই অবস্থা। বিজ্ঞান বা মানবিক শিক্ষার বেলায় যে ধরণের যত্নের ব্যবস্থা আছে তা শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট, গ্রন্থাগারের বেলায় নেই এটা অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও সত্য। তবু গ্রন্থাগারের কাজকে বিশেষত্বে মণ্ডিত ক'রে আজ তাকে এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে

উন্নীত ক'রেছেন গ্রন্থাগার কর্মীরাই। তাঁদেরই আভ্যন্তরীণ তাগিদ ও আদর্শের প্রতি অবিচলতার ফলে এটা সম্ভব হ'য়েছে। যদিও বেতনের হার কম, যদিও স্বীকৃতির মান নগন্য তবু তাঁদের চেতনা বা চৈতন্য কুয়াশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়নি। যাবার হেতুও নেই। স্বল্প বেতনে বিদ্যালয়াদির শিক্ষকরা যেমন শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেননা এবং বিদ্যালয়ের গৌরবে উন্নত-মস্তক, তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীরা অনুরূপ জ্ঞান বিতরণের গৌরবে গর্বান্বিত বোধ ক'রতে পারেন। পারিপার্শ্বিক বাধা বা ঔদাসিন্য তাঁদের বিচলিত ক'রতে পারবে না যদি তাঁরা পারস্পরিক এবং সামগ্রিক সহযোগ বজায় রেখে কাজ ক'রে যেতে পারেন। দেশ-জোড়া গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার-কর্মীর সঙ্গে তাঁদের লেন-দেন এবং কর্মে ও চিন্তায় যোগাযোগ রেখে চ'লতে হবে এক লক্ষ্যে। একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাঁদের যাত্রা— এই উপলব্ধি থাকলে কর্মী সহযোগের পথ সহজ হবে, সরল হবে, সুষ্ঠু হবে পরিচালনার ধারা।

গ্রন্থাগারের সমরকালীন ভূমিকা

দেশজোড়া বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের কাজ সাধারণত নির্দিষ্ট গণ্ডী বা আওতায় সীমাবদ্ধ থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের সহায়তায় সীমিত, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-সংস্থাদির গ্রন্থাগার সীমিত নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিষয়বিশেষে, জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলির কাজ আঞ্চলিক এবং সামাজিক প্রয়োজন-বৈচিত্র্যে সীমায়িত। নিজ নিজ ক্ষেত্রের পরিধি ছাড়িয়ে কার্যক্রম অবশ্যই ব্যাপ্ত হয়, এবং সেই ব্যাপ্তিই গ্রন্থাগারের লক্ষ্য সেকথাও সত্য, কিন্তু সেই বিস্তার আপন সীমাকে ভিত্তি ক'রেই হ'য়ে থাকে, অতিক্রম ক'রে নয়।

কিন্তু যেহেতু গ্রন্থাগার মানুষেরই সৃষ্টি, এবং দেশের প্রয়োজনে যথানুকূল সহায়তাই তার কাজ, তাই দেশের বা সমাজের অবস্থাবৈকল্যে স্বভাবতই গ্রন্থাগারের কাজে ব্যতিক্রম বা রকমফের হ'য়ে থাকে। যুদ্ধ অথবা অন্য কোনো কারণে দেশ যখন জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাদির মতো গ্রন্থাগারেরও সে ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব এবং করণীয় থাকে। এককালে গ্রন্থাগারের এই জাতীয় স্বীকৃতি বা মর্যাদা ছিল না। তার মর্যাদা ছিল অন্য ধরনের। জ্ঞানে বিজ্ঞানে ধর্মে দর্শনে সাহিত্যে বিদ্যাতে এক এক দেশ বা জাতি কী পরিমাণ মহিমান্বিত সেই গৌরবের নিদর্শন হিসেবে গ্রন্থসংগ্রহ বা গ্রন্থাগারের সমাদর ছিল। কিন্তু এখন সেই বিরল গৌরবের উচ্চ আসন রেখেও গ্রন্থাগার জনগণের দৈনন্দিন কাজের ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নেমে এসেছে। তাই দেশের সংকটে বা সমাজের সংকটে সে একান্তে স'রে থাকতে পারে না। বিদেশী রাষ্ট্র দ্বারা যখন দেশ আক্রান্ত হয় বা ব্যতিব্যস্ত হয়, যেমন ভারতবর্ষ হ'য়েছে চীন এবং পাকিস্তানের দ্বারা, তখন গ্রন্থাগারগুলিকে শ্রেণীনির্বিশেষে কতকগুলি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে একাগ্রভাবে কাজ ক'রে যেতে হয়। আপন আপন সীমার মধ্যে থেকেও ক্রিয়াক্রম প্রসারিত এবং বিশেষমুখী ক'রে তুলতে হয়, কখনো বা সীমা লঙ্ঘনও ক'রতে হয় বৃহত্তর প্রয়োজনে।

সমরকালীন সংকটে দেশের সরকারী বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানের, এমন কি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি দেশবাসীর বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকে। রণক্ষেত্রে যে

সৈনিক যুদ্ধ করেন তিনি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামী সৈনিক। কিন্তু তাঁর পিছনে থাকে প্রতিটি দেশবাসীর শুভেচ্ছা, প্রেরণা এবং সংযোগ। ক্রিয়াক্ষেত্র বিভিন্ন হ'লেও প্রত্যেক কর্ম একই সূত্রে গ্রথিত। দেশরক্ষার ব্যাপারে যুদ্ধ-সীমান্তই একমাত্র বিজয়ের ক্ষেত্র নয়, আধুনিক সমরে দেশ জু'ড়ে তার নৃত্য, তাই এই দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের। দেশের সকলেই পরোক্ষভাবে সংগ্রামী সৈনিক। দেশের ও সমাজের প্রতিটি কাজই সমরাঙ্গনের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। তাই যিনি যেখানে যে-কাজে আছেন, ছাত্র শিক্ষক ডাক্তার বিজ্ঞানী সাহিত্যিক অথবা ব্যবসায়ী চাষী মজুর, বা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, সকলেই যদি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ কাজ ক'রে যান এবং প্রতি পদক্ষেপে মনে রাখেন তিনি দেশের সেবা ক'রছেন, স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে চলেছেন, দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, শত্রুজয় নিজেরই সুখ আর শান্তির জন্য, তা'হলে কোনো শক্তিই সে দেশকে পরাভূত বা পর্যুদস্ত ক'রতে পারে না। নিজ নিজ মনোবল এবং চরিত্রবলই প্রধান অস্ত্র। দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সততা রক্ষা ক'রে চললে সেই সংহত শক্তি হয় অপরাজেয়। এই পরোক্ষ ভূমিকায় যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ব্রতী হয় তার মধ্যে গ্রন্থাগারের স্থান কতখানি তা নিয়ে হয়ত কারো কারো মনে সংশয় হ'তে পারে, কেননা এর কাজ প্রতিরক্ষার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু একটু চিন্তা ক'রলেই বোঝা যাবে যে গৌণ ভূমিকায় তো বটেই, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে মুখ্য ভূমিকাও গ্রন্থাগারগুলি নিতে পারে। কেননা, গ্রন্থাগার নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর ক'রবার, শিক্ষার প্রসার এবং তথ্যপ্রচারের, সর্বোপরি জনসংযোগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সংকটকালে যেসব দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয় তার মধ্যে একটা প্রধান অংশ জনগণের কাছে প্রকৃত তথ্য হাজির করা এবং তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা—নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অটুট রাখা। সমর-সময়ে স্বভাবতই মানসিক এবং নৈতিক প্রতিক্রিয়া হ'য়ে থাকে। এই প্রতিক্রিয়া দূর ক'রবার জন্য জনগণের কাছে সংকটের স্বরূপ, জরুরীকালীন অবস্থার প্রয়োজনীয়তা, সমারাঙ্গনের প্রকৃত অবস্থা —যুদ্ধের 'কী ও কেন' জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে জনসাধারণকে অবহিত রাখা এবং জাতীয়তার চেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। যেমন, চীনা আগ্রাসী নীতির অহেতুক হেতু নির্ণয় এবং পাকিস্তানের আক্রমণের প্রকৃত মতলব ও

স্বরূপ উদ্ঘাটনের সূত্রে যুদ্ধবর্তী এলাকার ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্পষ্ট ধারণা এনে দিলে তারা সহজেই বুঝতে পারবে কিভাবে দেশ বিশ্বাসঘাতকের এবং প্রসারলোভী রাষ্ট্রের কাছে লাঞ্ছিত হ'তে চলেছে। এবং সেই বোধ থেকে তারা সংহত হবার প্রেরণা লাভ ক'রবে। দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য এবং রাষ্ট্রদ্রোহী গুপ্তচরদের নাশকতামূলক কাজ বন্ধ ক'রবার জন্য প্রতিটি নাগরিক সচেতন ও তৎপর হ'য়ে উঠতে পারবে। এই প্রচারের কাজ একভাবে রেডিয়ো মারফত হ'তে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ সাধারণের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে, পুস্তিকা ও ইস্তাহারের সাহায্যে, বক্তৃতা ও চলচ্চিত্রাদি দৃষ্টি-শ্রুতিসম্বলিত প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সহজেই জনগণের দুয়ারে দুয়ারে হাজির হ'তে পারে। অনর্থক গুজব যাতে না ছড়ায় সেজন্য এইভাবেই গ্রন্থাগার কাজ ক'রে যেতে পারে। অশিক্ষা এবং অজ্ঞতাই গুজবের ভিত্তি। গ্রন্থাগার শিক্ষা ও জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে অনায়াসেই জনগণের মনে প্রত্যয় এনে দিতে সক্ষম।

যুদ্ধবর্তীকালে নানান বিপর্যয়ে জনগণের মনোবল ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব। একে তো জরুরী অবস্থার জন্য দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে, তার উপরে অনিশ্চিতির জন্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্প্রদীপ ইত্যাদি অবস্থায় অবসর-যাপনের উপকরণের অভাব ঘটে। সিনেমা নাটক প্রভৃতি প্রমোদকেন্দ্র হয় পুরোপুরি নয়তো আংশিকভাবে বন্ধ থাকে। ফলে সময়ের ভার এবং অনিশ্চিতির বোঝা মানুষের মনে চেপে ব'সে তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে পারে। গ্রন্থাগার এই সময়ে তার পাঠ্যপুস্তকাদির পসরা নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হ'লে এই অভাববোধজনিত শূন্যতা ভ'রে ওঠে। সমর-সংকটের কথা মনে রেখে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি তথ্যাদিবিশ্লেষণে ও যুক্তিপ্রয়োগে সাধারণের ভ্রান্তি দূর ক'রে তাদের ওয়াকিবহাল রাখতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এই কাজ ব্যাপকভাবে নেবার জন্য বিশেষ কার্যক্রম খাড়া ক'রে নিলে ধারারক্ষা সহজ হয়। বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির এই অবস্থায় আরো কিছু করণীয় থাকে। নিজ নিজ ক্ষেত্রের তথ্যাদিসম্বলিত বিবরণী বা তালিকা তারা প্রস্তুত ক'রবে, উপকরণাদির উৎপাদন সম্পর্কে জরীপ ক'রে নির্ধারণ ক'রবে তা প্রয়োজনানুকূল কিনা, কিভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় তার নির্দেশ দেবে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোথায় সাম্প্রতিকতম কোন আবিষ্কার বা উন্নতি হ'য়েছে তার

খোঁজ রাখবে এবং দেশোপযোগী ক'রে কিভাবে সেসব তৈরি ক'রে কাজে লাগানো যেতে পারে তা নির্ণয় ক'রবে।

যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সমরকালে নানাভাবে দেশের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচ ক'রতে হয়। এই ব্যয়কৃচ্ছ্রতা স্বভাবতই গ্রন্থাগারকে স্পর্শ করে বিশেষভাবে। সুতরাং এই সময়ে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ-প্রকল্প স্থির ক'রতে হয় খুব বিবেচনার সঙ্গে। প্রতিরক্ষাদি ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বই ছাড়া অন্যান্য বই কেনা অপরিহার্য কিনা ভেবে দেখতে হয়। অথচ কোনো বিষয়ই অবহেলা করা চলবে না। অবসর বিনোদনের জন্য হালকা মেজাজের বইও বাদ দেওয়া যায় না। তবে, সাধারণত বিবিধ পুস্তকের একাধিক সংখ্যা গ্রন্থাগারে রাখা হয়, জরুরী অবস্থার সময়ে এই সংখ্যাধিক্য বর্জন ক'রে পরিমিত সংগ্রহের ব্যবস্থাই বিধেয়। কিন্তু অপর একটি দিকে পুস্তকের প্রচার স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বাড়াতে হয়। সমরাঙ্গনে ব্যাপৃত সৈনিকদের জন্য ও হাসপাতালে আহত সৈনিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং পত্রিকা সরবরাহ করা যেমন দরকার তেমনি দরকার তাঁদের অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে হালকা ধরনের বই। তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত রাখবার জন্য যেমন কালানুযায়ী বই বণ্টন ক'রে দিতে হয় তেমনি তাঁদের স্নায়ু যেন বিশ্রাম পায় সেজন্য নানধরনের সাহিত্য, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি শ্রেণীর বইও দিতে হয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিনী সংস্থা থেকে যেভাবে প্রচুর সংখ্যায় বিশেষ যুধ্যমান-সেনা সংস্করণের বহুল প্রচার হ'য়েছিল সেকথা এখনও নিশ্চয় সকলের মনে আছে।

এই হ'ল গ্রন্থাগারের প্রচারপ্রকল্পের সমরকালীন ভূমিকা। সমর সময়ে গ্রন্থাদি সংরক্ষণের দিকেও বিশেষভাবে নজর দিতে হয়। কোনো কোনো বিষয়ে প্রচার-বিমুখও হ'তে হয়। মানচিত্র প্রভৃতি নানাবিধ তথ্য-সম্ভার যাতে শত্রুদের চরের হাতে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়। আবার এই জাতীয় তথ্যাদি উপকরণ যাতে বোমা-বর্ষণে বা অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস না হ'তে পারে তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও তথ্যসম্ভার সুরক্ষিত কোনো স্থানে অথবা ভূগর্ভস্থ কোনো কামরায় সযত্নে রাখা যেতে পারে। অথবা বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা নিয়ে সমরাঙ্গনের নিকটবর্তী এলাকা থেকে এবং বোমাবর্ষণ সম্ভব এমন সব বড় বড় শহর থেকে স্থানান্তরিত ক'রে দূরবর্তী

ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় নিয়ে রাখা যায়। এক্ষেত্রে সব সামগ্রী একই জায়গায় না রেখে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রাখা উচিত, তাহ'লে অন্তত আংশিক-ভাবে রক্ষা পাবে। এছাড়াও আরেকটি উপায় অবলম্বন করা দরকার, বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের একাধিক নকল ক'রে সেগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রাখা। আজকাল এ-কাজ আলোকচিত্রের সহায়তায় অনায়াস হ'য়েছে। ফোটোষ্টাট পদ্ধতিতে সহজেই নকল করার কাজ সমাধা হয়। মাইক্রোফিল্ম পদ্ধতিতে বৃহৎ ও বিরাট গ্রন্থাদি এবং নথিপত্রাদি অত্যন্ত অল্প জায়গার মধ্যে সঞ্চিত ক'রে রাখা যায়। এইভাবে অনেকগুলো প্রতিলিপি তৈরি ক'রে নানান জায়গায় গচ্ছিত থাকলে মূল বা কোনো প্রতিলিপি বিনষ্ট হ'লেও বিলুপ্ত হ'য়ে যাবার ভয় থাকে না।

এইভাবে গ্রন্থাগার দেশের সম্পদ রক্ষায় এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষায় নানাভাবে কাজ ক'রে যেতে পারে। এই কাজে দেশের বিভিন্ন ভাগে অবস্থিত গ্রন্থাগার-গুলির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং সমঝোতা বজায় রেখে চলা দরকার। আর্থিক বা পারিপার্শ্বিক কারণে একই গ্রন্থাগারের পক্ষে সর্বশ্রেণীর কাজের ভার নেওয়া সম্ভব নাও হ'তে পারে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োজনও ভিন্নতর হ'তে পারে, ক্রিয়াপদ্ধতিতেও অনৈক্য থাকতে পারে। সমরস্থলের নিকটবর্তী গ্রন্থাগারের পক্ষে যে ধরণের কাজ করা উচিত বা যে জাতীয় কাজ করা সম্ভব দেশের অন্য অংশে অবস্থিত গ্রন্থাগারের সঙ্গে তার মিল না থাকা অথবা সঙ্গতি রেখে চলতে না পারাই সম্ভব।

তাই একেক কেন্দ্রে অবস্থিত গ্রন্থাগার যদি একেকটি বিষয়ের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেন, এবং জাতীয় গ্রন্থাগার শ্রেণীর কোনো বৃহৎ কেন্দ্রের সঙ্গে এগুলির যোগ থাকে, অথবা এই জাতীয়-কেন্দ্র থেকেই বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তাহ'লে সুসংহতভাবে কাজ হ'তে পারে। আরেকটি কথা, কেবলমাত্র বর্তমানের প্রতি নজর রাখলেই চ'লবে না, অতীতের নজির নিয়ে যেমন বর্তমানের কর্মপদ্ধতি এবং ফলশ্রুতি নির্ধারণ সমীচীন, তেমনি ভবিষ্যতের প্রতি নিবদ্ধ-লক্ষ্য না হ'লে কার্যফল সুদূর প্রসারী বা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী হবে না। সাম্প্রতিক অবস্থা থেকেই পাঠ নিতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণ করা যায়। এককালীন ত্রুটিবিচ্যুতি পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়। যুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থার ফলে দেশের সামাজিক রাষ্ট্রিক অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।

যুদ্ধের শেষে এক নূতন সমাজের সৃষ্টি হয়। আইন-কানুন, রীতি-নীতি, জীবন-যাপনের মান বা জীবনধারা বিবর্তিত হয়। এমনকি এর প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্তি এসে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রতে পারে। গ্রন্থাগারের কাজ হওয়া উচিত এই আশঙ্কার প্রতি সচেতন থেকে তা যাতে রোধ করা যায় সেইভাবে পরিকল্পনা তৈরি করা। জনকল্যাণের চৈতন্যশীল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রন্থাগারের স্থান আধুনিক জগতে অনস্বীকার্য। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজে তরঙ্গের পরে তরঙ্গ আসতে পারে, কখনো শিথিল কখনো তৎপর হবার কারণ ঘ'টতে পারে, কিন্তু গ্রন্থাগারের কাজ স্থিরলক্ষ্য, চিরপ্রবহমান। জন-কল্যাণ ও জনসংযোগের প্রতিষ্ঠান নানারকমের। সরকারী, বেসরকারী, আধা-সরকারী। যে-কোনো দেশের সরকার ব'লতে বোঝায় জনগণের স্বার্থ ও সুখের প্রতি নজর দেবার জন্য জনগণেরই প্রতিনিধি এক সংস্থা। কিন্তু তবু শাসনের কাজে, আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয় ব'লে সরকার তরফে কতকগুলি নীতি মেনে চ'লতে হয়, যার ফলে অনেক সংকল্পেরই সরাসরিভাবে রূপ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেজন্য দেশে নানা ধরনের আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে, যেগুলি বিবিধ বন্ধন থেকে মুক্ত অবস্থায় কাজ ক'রে যেতে পারে। গ্রন্থাগার এই জাতীয় একটি প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এখানে সর্বসাধারণ সহজেই এসে মিলতে পারে এবং সহজ হ'য়ে উঠতে পারে। তাই যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তার তৎপরতার ক্ষেত্র যেমন মুক্ত, তেমনি যুদ্ধাবসানে গঠন-কর্মের সহায়তাও তার পক্ষে সহজ। দেশের দায়-উদ্ধারে যেমন লিপ্ত থাকতে হবে, তেমনি দায়মুক্ত দেশের দায়িত্ব তুলে নিতে হবে গ্রন্থাগারকেই।

সাময়িকী

সাময়িকী সম্ভারঃ বিচিত্ররূপ—সাময়িক পত্র-পত্রিকা সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারেরই বিশিষ্ট এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গ্রন্থাগারের সাময়িকী বিভাগের সংগঠন এবং পরিচালনার ব্যাপারটা গ্রন্থাগার পরিচালকের ঘাড়ে প্রায়ই ভূতের মতো চেপে বসে। নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব ঘ'টলে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। জ্ঞানসামগ্রী ও তথ্যসম্ভারের ব্যাপ্তি ও সহজলভ্যতা ব্যাহত হয়। বিদ্যাক্ষেত্রে পুস্তকের চেয়েও পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বেশি। কেননা, আধুনিকতম চিন্তাধারা এবং/অথবা প্রাচীনতম ঐতিহ্য-ইতিহাসের সূত্রগুলি পুস্তকাকারে রূপ নেবার আগে প্রবন্ধাকারে নানাবিধ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে বই হ'য়ে আর বেরোয় না,—সাময়িকীতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সুতরাং গবেষণা বা বিশেষ কোনো জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে সাময়িকী অপরিহার্য। কিন্তু বিশাল এর পরিধি এবং বিচিত্র তার প্রকাশধারা। তাই কোনো সহজ সন্ধানসূত্র না থাকলে বিশেষ কোনো একজনের পক্ষে জ্ঞানস্তরের সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো বিশেষ প্রবন্ধ শুধুমাত্র যে নির্দিষ্ট বিষয়-সংক্রান্ত সাময়িকীতেই প্রকাশিত হয় তাই নয়, সাধারণ পত্রিকাতেও এ ধরণের প্রবন্ধ দেখা যায়। সাময়িকী-সমুদ্রের মধ্যে তাই যদি কেউ দিশেহারা বোধ করেন তাহ'লে বিস্ময়ের কিছু নেই। সুতরাং কেবলমাত্র সাময়িকী-সংরক্ষণেই আজকাল কোনো গ্রন্থাগারিক সন্তুষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। প্রবন্ধ-সম্ভার নানাবিধ উপায়ে গবেষকদের গোচরে আনবার চেষ্টা ক'রতে হয়।

সাময়িকীর সংবাদ-সম্ভারের এই বৈশিষ্ট্যের দিক যেমন, তেমনি অন্যদিকে আছে এর পরিচালনার সমস্যা, পত্রিকাদি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের বিধি-ব্যবস্থা, ব্যয়বরাদ্দ—যেটা স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান, অথচ যে-দিকটা পূর্ব-পরিকল্পিত না থাকলে অনেকাংশে জটিলতার সৃষ্টি করে। আরেকটি সনাতন অসুবিধা—গ্রন্থাগারিক ছাড়া কর্তৃপক্ষের আর কেউ তেমনভাবে এ দিকটা উপলব্ধি করেন না। ফলে, প্র'য়ই দেখা যায় সাময়িকীর স্তূপ জ'মে যাচ্ছে অথচ তা

সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে ভেবেচিন্তে গ্রন্থাগারিক সাময়িকী বিভাগ সাজান এবং গ'ড়ে তোলেন।

সাময়িকী কাকে বলে? যে-সব প্রকাশন ধারাবাহিকতা রক্ষা ক'রে চলে তাই সাময়িকী। এই ধারাবাহিকতা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ হ'তে পারে, বিষয়বিশেষে সীমাবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু কোনো চলতি পরিকল্পনার অংশ বা অঙ্গ হিসাবে প্রকাশিত হওয়া দরকার। খণ্ডবদ্ধ বই—তা সে যত খণ্ডে এবং যত দিন ধ'রেই প্রকাশিত হোক না কেন, তাকে সাময়িকী বলা যাবে না। কেননা সে সমগ্রতা বজায় রাখে। নিঃশেষিত হবার পর নূতন পর্যায়ে নূতন সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করে। অপরপক্ষে মাসিকী বা বার্ষিকীগুলি আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র ব'লে মনে হ'লেও কালের ধারায় তা নিরবচ্ছিন্ন। এর সংস্করণ হয় না। তাই সাইক্লোপিডিয়াজাতীয় কোষগ্রন্থাদি সাময়িকী নয়, কিন্তু আদমশুমার বা লোকগণনার বিবৃতিকে সাময়িকীর পর্যায়ে ফেলতে পারি।

কতরকম চেহারায় সাময়িকীর প্রকাশ তার একটা হিসাব নেওয়া যাক। নিয়মিত প্রকাশক্রমের সাময়িকী ব'লতে আছে দৈনিক সংবাদপত্র; সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্র-পত্রিকা; মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক পত্রিকা; বার্ষিকী বা বর্ষপঞ্জী, পঞ্জিকা। অনিয়মিত ক্রমে প্রকাশিত পর্যায়ে পাই সভা, সমিতি, সঙ্ঘাদির প্রতিবেদন; সরকারী বিবৃতি; ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ধারাবিবরণী; বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কর্মসূচী ও বিবরণাদি; স্মারক (souvenirs) এবং পুস্তিকা (pamphlets)।

সংগ্রহ: রীতি ও নীতি—সাময়িকী সামগ্রী নিয়ে বিচারের প্রথমেই এগুলি সংগ্রহের কথা ওঠে। পত্র-পত্রিকাদি সংগৃহীত হয় তিনটি উপায়ে; গ্রাহক-চাঁদা দিয়ে, বিনিময় প্রথায় এবং উপহার হিসেবে পেয়ে। গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব অনুযায়ী সংগ্রহের নীতি স্থির ক'রতে হয়। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে যেরকম সংগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা কেন্দ্রের সংগ্রহ তার থেকে আলাদা। জনসাধারণের গ্রন্থাগার হ'লেই যে তাবৎ পত্রিকা রাখতে হবে তার কোনো কথা নেই। রাখা সম্ভবও হয় না। আর্থিক এবং সংরক্ষণের দিক বিবেচনা ক'রতে হয়। সাধারণভাবে এই নীতি চ'লতে পারে যে, গ্রন্থাগার যে-এলাকায় অবস্থিত এবং তার পাঠকশ্রেণী যে-ধরনের, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সংগ্রহ করা

উচিত। এর অতিরিক্ত পত্রিকা যাঁরা প'ড়তে চাইবেন তাঁরা অন্য গ্রন্থাগারের শরণ নেবেন। সীমা লঙ্ঘন ক'রলে সামলানো কঠিন হ'য়ে পড়ে। সাধারণ বা জন-গ্রন্থাগারগুলি অবশ্যই এমন সব সাময়িকী রাখবে যেগুলি সাধারণ পত্রিকা, সর্বাশ্রয়ী যার ধরণ—কোনো বিষয়-বিশেষে নিবিষ্ট নয়। কিন্তু স্থানিক ইতিহাস বা স্থানিক বিশেষত্ব সংক্রান্ত সাময়িকী তাদের সংগ্রহভুক্ত থাকবে। যেমন, কোনো শিল্প বা বাণিজ্য এলাকার গ্রন্থাগার তৎসংক্রান্ত কিছু বিশেষ পত্র-পত্রিকা সংগ্রহে রাখতে পারে। স্থানীয় কোনো সাময়িকী থাকলে তারও গ্রাহক হওয়া দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনগুলি নিজ নিজ পাঠক্রম ও বিষয়ানুকূল পত্র-পত্রিকা সাময়িকী সম্ভার নিয়ে কাজ-কারবার ক'রবেন, এবং বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি তাদের নির্দিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্র নিয়ে নির্বাচন-প্রকল্প তৈরি ক'রবেন,—একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষ গ্রন্থাগার তার প্রয়োজনমতো সাময়িকী সংগ্রহ ক'রবে, সে ব্যাপারে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু শিক্ষায়তন ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের আওতায় সব রকমের বিষয় থাকে ব'লে সাময়িকী নির্বাচন ভেবে চিন্তে ক'রতে হয়। খরচের কথা যেমন ভাবতে হয় তেমনি স্থানসংকুলান এবং পরিচালনার সমস্যাও থাকে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ত বা বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ শাখার,—কোনোটাতে বা শিল্পবিদ্যা মানববিদ্যা (humanities) প্রভৃতির বিশেষ প্রশাখার অতিরিক্ত পাঠ বা গবেষণার ব্যবস্থা থাকে। সে সব ক্ষেত্রে সাময়িকী সংগ্রহ ব্যাপকতর ক'রতে হয়। এ যুগের বিশাল পরিধির কথা মনে ক'রে একটা যৌথ বোঝাপড়ার পত্তন হ'লে ভাল হয়। একই গ্রন্থাগারের পক্ষে যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ের সাময়িকী সংগ্রহ সম্ভব নয়, সেহেতু লেনদেনের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রথা চালু থাকা দরকার। তা'হলে কোনো একটি বিশেষ এলাকাতেই যৌথভাবে তাবৎ বিষয়ের সম্পূর্ণ সাময়িকী সংগ্রহ গ'ড়ে উঠতে পারে।

পত্রিকা নির্বাচনের জন্য হাতের কাছে তালিকা থাকা দরকার। এ জাতীয় কিছু বই বাজারে চালু আছে। যেমন, Ulrich's Periodicals Directory, Nifor Guide to Indian Periodicals, Index Bibliographicas, Annual Index to Indian Periodicals, ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত কিছু কিছু তালিকাগ্রন্থ আছে, আছে প্রকাশক সমিতি প্রভৃতির

কিছু নির্বাচিত তালিকা। দেশী-বিদেশী সাময়িকীর গ্রাহক হিসেবে জুটিয়ে দেবার জন্য কিছু সংস্থাও আছে যাদের মাধ্যমে সাময়িকী সংগ্রহ করা যায়।

সাময়িকীর ব্যয়বরাদ্দ—সাময়িকী সংগ্রহের আরেকটি দিক আছে যেটি সকলে হয়ত আগে থেকে ভেবে রাখেন না। এটি আর্থিক দিক। পত্রিকার জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক গ্রন্থাগারের হিসেবের মধ্যে ধরা থাকে। কিন্তু একবার কোনো পত্রিকার গ্রাহক হ'লে প্রতি বছরই সেই খরচ চ'লতে থাকে, এবং নূতন কোনো পত্রিকার গ্রাহক হওয়া মানেই বরাবরকার মতো সেই পরিমাণ খরচ বৃদ্ধি। উপরন্তু চলতি এবং জমতি সব মিলিয়ে পত্রিকাগুলি ক্রমে প্রচুর জায়গা নিতে থাকে। সুতরাং সেগুলিকে মজুত রাখবার জন্য আসবাবপত্র বাড়াতে হয়। খুচরো সংখ্যাগুলিকে খণ্ডে খণ্ডে বাঁধিয়ে রাখবার খরচও কম নয়। অর্থ মঞ্জুরীর সময় এই দিকেও লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা ক'রতে হয়। সাময়িকী খাতে খরচের জন্য মূল পুস্তক-ক্রয় খাতে ব্যয়ের শতকরা পনের/কুড়ি ভাগ বরাদ্দ করা হ'লে সব দিক বজায় রাখা সম্ভব। বলা বাহুল্য, আসবাবপত্র এবং পরিচালনার খরচ স্বতন্ত্র। পরিচালনায় প্রতি হাজার সাময়িকীর জন্য সর্বতোভাবে একজন কর্মী আংশিক সহায়কসহ কাজ চালাতে পারে। এক হাজারের উর্ধ্বে দু'হাজার পর্যন্ত সাময়িকীর জন্য দু'জন পুরো সময়ের কর্মী এবং অনুরূপ আংশিক সহায়ক প্রয়োজন। তার বেশি হ'লে পর স্বতন্ত্র একটি সাময়িকী বিভাগই গ'ড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়।

সাময়িকী সংগ্রহের খরচের একটা আভাস দেওয়া যায় বিলিতি হিসেবের। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিস্টল শহরের সাধারণ গ্রন্থাগার এটি তৈরি ক'রেছিল। কোনো একটি পত্রিকার দাম ধরা যাক ২ শিলিং। বিলেতে ঘর গরম রাখতে হয়, (এদেশেও হয়ত শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দরকার),—এই তাপ খরচা সাকুল্যে বাৎসরিক ১৫০ পাউণ্ড। আলোর খরচ ৭৫ পাউণ্ড। পরিচ্ছন্নতা ও সজ্জাদির জন্য ১৮০ পাউণ্ড। কর্মীদের বেতনাদি বাবদ ৫০০ পাউণ্ড। বাড়িভাড়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ৭৫০ পাউণ্ড। দাঁড়াল গিয়ে সর্বমোট ১৭৫০ পাউণ্ড। অর্থাৎ, একটি পত্রিকার জন্য মঞ্চ-মজুতি খরচের ভাগ পড়ে সওয়া দুই শিলিং-এর মতো। সাধারণত বইএর চেয়ে পত্রিকা আকারে বড় হয়, বাঁধানোর পর মোটাও হ'য়ে যায়। এজন্য প্রত্যেকটির খাতে বাড়তি মঞ্চ-মজুতি খরচ ধরা যেতে পারে তিন পেনি ক'রে। এবং বাঁধাই খরচ আন্দাজপক্ষে ২৫ শিলিং। বাড়ল বছরে আরো

দেড় পাউণ্ড মতো। তাহ'লে, সব রকমের খরচ জড়িয়ে প্রতি খণ্ড বাবদ বছরে সওয়া চার পাউণ্ডের মতো পড়ে। আমাদের দেশেও এর চেয়ে বিশেষ উনিশ-বিশ হবার কিছু কি কারণ আছে ?

সংগঠন ও পরিচালনা—সাময়িকী বিভাগ অবশ্য সব গ্রন্থাগারেই স্বতন্ত্র কক্ষে রাখা উচিত। কার্যত তা না রাখলে চলেও না। সাময়িকীর ধরণ-ধারণ বই-এর সঙ্গে মেলে না ব'লে এর পরিচালনার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম আলাদা ক'রে রাখা ভাল। হিসাব থেকে সুরু ক'রে প্রযুক্তি-প্রকল্প পর্যন্ত।

সাময়িকীর জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ রাখলে এর নির্ণয়কৃত্য (reference service) সুবিন্যস্ত ভাবে গ'ড়ে তুলবার সুবিধে হয়। সঞ্চালন-পর্বটিকে (circulation system) সুসম্বদ্ধ করা যায়, এবং বর্গ-বিভাজনেও স্বাতন্ত্র্য রেখে পূর্ণাঙ্গ ক'রে সাজানো সম্ভব হয়। সাধারণত ছোটখাট জন-গ্রন্থাগারে বা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে এক বা একাধিক পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগটি কাজ করে। এবং কেবলমাত্র চলতি সংখ্যাগুলিই এর আওতায় থাকে। বছর শেষ হ'লে অথবা কোনো খণ্ড পুরলে পত্রিকাগুলি বাঁধিয়ে বই-এরই মতো মূল সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ক'রে মঞ্চস্থ করা হয়। পত্র-পত্রিকা সাধারণত প'ড়বার জন্য গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। কেন না, কোনো খণ্ড হারিয়ে গেলে পুনরায় সেটি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। এজন্য সমগ্রভাবে সাময়িকীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা ভাল। পত্রিকা পাঠকের গোচরীভূত ক'রবার জন্য সুসম্বদ্ধভাবে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা দরকার। নচেৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়। বাঁধানোর আগে পর্যন্ত এগুলিকে যথানিয়ম গ্রন্থসংখ্যাভুক্ত করা যায় না ব'লে বিশিষ্ট কোনো ধারা অনুসরণ ক'রে সাজিয়ে রাখতে হয়। এই ধারা বিষয়ানুযায়ী হ'তে পারে, বর্ণানুক্রমিকও হ'তে পারে। সাধারণের সুবিধের জন্য বর্ণানুক্রমে সাজানোই ভাল। সাময়িকী-বিন্যাসের নানারকম আসবাব বা মঞ্চ থাকে। স্বল্প পরিসরে অধিক পত্র-পত্রিকা রাখবার জন্য খোপযুক্ত থাকবিশিষ্ট মঞ্চই উপযুক্ত। এর একেকটি খোপে এক বা একাধিক পত্রিকাও রাখা যায়। এগুলির উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি হ'লে ব্যবহারিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র চলতি সংখ্যা নয়, সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিও সংলগ্ন খোপে একই সঙ্গে গুছিয়ে রাখার জন্যও আরেক ধরণের মঞ্চ আছে,—চোখের সামনে ধরা থাকে চলতি সংখ্যাটি

আর পিছনে রাখা থাকে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি। এর নিচের তাকে বার্ষিকী বা বর্ষপঞ্জী রাখারও ব্যবস্থা থাকে।

সাময়িকীর আকার বড় হয় ব'লে বাঁধানোর পর রাখবার জন্য বড় মাপের তাকবিশিষ্ট মঞ্চের প্রয়োজন। এর উচ্চতাও বেশি না হ'য়ে মানুষ-প্রমাণ, অর্থাৎ ৫ ফুট আন্দাজ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তা না হ'লে ভারি ভারি পত্রিকার খণ্ডগুলি ওঠানো নামানো যেমন দুষ্কর হয় তেমনি ছিঁড়েখুঁড়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে। দৈনিক পত্রিকার জন্য স্বতন্ত্র ধরণের মঞ্চ প্রয়োজন। এগুলো খাড়া ক'রে রাখলে বারবার নামানো আর তুলে রাখা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি দুমড়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই একটার পর আরেকটা ক'রে সাজিয়ে শুইয়ে রাখতে হয়। এজন্য চওড়া ও দীর্ঘ অথচ কম উচ্চতার খোপওয়ালা মঞ্চ প্রয়োজন।

সাময়িকী মজুতির জন্য কতটা জায়গা লাগে তার একটা হিসেব নেওয়া যাক। গ্রন্থাগারিক যখন পরিকল্পনা ক'রবেন তখন আগামী কুড়ি বছরের মতো হিসেব ক'রে কাজে হাত দিলেই চ'লতে পারে। এককেটি বাঁধানো খণ্ড যদি গড়পড়তা তিন ইঞ্চি চওড়া ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়, এবং প্রত্যেক মঞ্চে যদি পাঁচটি ক'রে তাক থাকে তাহলে বছরে প্রতি হাজার খণ্ডের জন্য সাকুল্যে তিন হাজার ইঞ্চি, অর্থাৎ ২৫০ ফুট জায়গা দরকার। এককেটি মঞ্চ যদি তিন ফুট চওড়া হয় তাহ'লে ৮৫টি মঞ্চ প্রয়োজন। যদি দু'মুখো মঞ্চ হয়—দুই দিকে সংগ্রহ রাখাই ভাল—তাহ'লে বছরে এক হাজার খণ্ড সাময়িকীর জন্য ৮½ টি মঞ্চ লাগছে। কুড়ি বছরে ১৭০ টি। প্রত্যেকটি মঞ্চের মাঝখানে তিন ফুট ক'রে ব্যবধান রাখা উচিত। তাহ'লে মোট জায়গা লাগে ২৭০০ বর্গফুট। অর্থাৎ, প্রতি খণ্ডের জন্য তিন বর্গফুট। বাঁধানো সাময়িকীর সঙ্গে যদি চলতি সংখ্যা-গুলিও রাখা যায় তাহ'লে হাজার প্রতি অন্তত পক্ষে তিন হাজার বর্গফুট জায়গা দরকার।

নথিভুক্তি ও সূচী—সাময়িকীর নথিভুক্তি নিয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকাগুলি ঠিকমতো এসে পৌছাচ্ছে কিনা, কোন্‌গুলির জন্য স্মারক চিঠি পাঠাতে হবে, কখন কোন পত্রিকার চাঁদা ফুরিয়ে যাচ্ছে, কখন কোন গুচ্ছ বাঁধাতে হবে,—এইসব নানান দিকে নজর রাখতে হয়। তালিকাভুক্তির কাজ বিচিত্র। সাময়িকীর মূল্য প্রায়ই পরিবর্তিত হয়, আকারেও পার্থক্য হয়, প্রকাশকালের বা প্রকাশক্রমের বিভিন্ন ধারা থাকে,—কতক পত্রিকার তো

নির্ধারিত কোনো প্রকাশক্রমও থাকে না। বিভিন্ন সূত্র থেকে পত্রিকা আসে ব'লেও কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। এর উপরে ভবিষ্যতে আরো যেসব পত্র-পত্রিকা আসতে পারে সেগুলির অন্তর্ভুক্তির কথাও আগে-ভাগে ভেবে রাখতে হয়।

তালিকার জন্য বাঁধানো খাতা অথবা অলগ্ন-পত্রের খাতা রাখা যেতে পারে। আর রাখা যেতে পারে পত্রক বা কার্ড তালিকা। লিপিবদ্ধ ক'রতে হয় পত্রিকার নাম (কখনো বা সম্পাদকের নামও, প্রয়োজন বা গুরুত্ব বুঝে), প্রকাশক্রম, প্রাপ্তির সূত্র, বৎসরারম্ভ, প্রথম সংখ্যার তারিখ, চাঁদার হার, এবং পর্যায়ক্রমে যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার উল্লেখ। বাঁধানো খাতায় তালিকা রাখার একটা অসুবিধা এই যে কোনো নির্দিষ্ট সাময়িকীর উল্লেখপরম্পরায় কতগুলি পাতা লাগবে তা আগে থেকে নির্ধারণ ক'রে রাখা সম্ভব হয় না। তাই পাতা ফুরিয়ে গেলে 'অমুক পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য' জাতীয় নির্দেশ, অথবা একটা সূচীপত্র-মাধ্যমে পত্র-নির্দেশের অস্বস্তিকর পদ্ধতিতে কাজ চালাতে হয়। আবার যখন কোনো নূতন সাময়িকীর নাম যোগ ক'রতে হয় তখন এই পরম্পরাক্রম উলটো-পালটা হ'য়ে যায়। অলগ্ন-পত্রের খাতায় এই অসুবিধা থাকে না। একটা পাতা শেষ হ'লে আরেকটা পাতা যোগ ক'রে নেওয়া সহজ হয়। নূতন কোনো পত্রিকার বেলাতেও জায়গামতো পাতা ভ'রে নিলেই চলে। তবে এই দুই ক্ষেত্রেই প্রধান অসুবিধার দিক হ'ল বারবার খাতা টেনে বা'র করা আর খোলা আর বন্ধ করার প্রথাটা ক্লান্তিকর, হয়ত সময়সাপেক্ষও। এবং এভাবে টানা-হ্যাঁচড়াতে খাতাটি ছিঁড়ে গেলে সাময়িকভাবে কাজও অচল হ'য়ে প'ড়তে পারে।

পত্রক-তালিকার জন্য ৮"×৬" ইঞ্চি অথবা ৬"×৪" ইঞ্চি মাপের পত্রক (card) ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এর কার্যকরী সুবিধা অনেক। অদল-বদল বাতিল ইত্যাদির প্রয়োজনে সহজেই বার ক'রে নেওয়া চলে। নূতন সাময়িকী সংযোজন হ'লে তার জন্য নূতন একটি পত্রক ঢুকিয়ে নিলেই হ'ল। এতে খরচের দিকেও কিছু সাশ্রয় হয়। সমগ্র সাময়িকীসংগ্রহের হিসেব একই আধারে রাখা যায় ব'লে কাজেরও সুবিধে হয়। তালিকার খাতা শেষ হ'য়ে গেলে আরেকটি খাতা তৈরি ক'রতে হয়। এমনি ক'রে খাতার পরে খাতা জমে গেলে নথি ঘাঁটতে পরিশ্রম বাড়ে, জটিলতাও দেখা দেয়। সংগ্রহ যদি প্রচুর হয় তাহলে একটি খাতাতে কুলোয় না, একাধিক খাতা করার প্রয়োজন

দেখা দেয়, অথবা একটি খাতাতেই লিপিবদ্ধ ক'রতে গেলে তা বৃহদায়তন হ'য়ে পড়ে, নাড়াচাড়া ক'রতেও বেগ পেতে হয়। কিন্তু পত্রক-তালিকায় একটি বাক্সের মধ্যেই তাবৎ সংগ্রহের হিসেব থাকে ব'লে এই জাতীয় বাধার সৃষ্টি হয় না। পত্রকগুচ্ছ নিজ নিজ ব্যবহারিক সুবিধে অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা যায় ব'লে বিশেষ বিশেষ কাজের পক্ষেও অনুকূল হ'তে পারে। খাতার ক্ষেত্রে সে সুবিধে নেই। পত্রক-তালিকা বর্ণানুক্রমে, বিষয়ানুসারে, প্রকাশক্রম-অনুযায়ী অথবা অন্য যে কোনো রকম পদ্ধতিতে সম্বদ্ধ ক'রে রাখা সম্ভব। এই বিন্যাসের মধ্যে আবার প্রয়োজনমতো স্বতন্ত্র নির্দেশকও রাখা যেতে পারে। যেমন, তালিকা যদি প্রকাশের ক্রম ধ'রে সাজানো হয় তাহ'লে সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি অনুক্রমে নির্দেশক পত্রক থাকতে পারে। আবার যদি কেউ প্রাপ্তির তারিখ ধ'রে সাজান তাহ'লে মাসিকের ক্ষেত্রে মাস অনুসারে বা সাপ্তাহিকের বার অনুযায়ী অনুক্রমবদ্ধ করা যেতে পারে। অর্থাৎ সমগ্র বিন্যাসটাই আওতার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়।

সাময়িকী সূচীপত্রকের সঙ্গে পুস্তক-সূচীপত্রকের মিল বেশি নেই। পুস্তক-সূচীকে স্থিতিশীল (static) এবং সাময়িকী সূচীকে গতিশীল (dynamic) বলা যেতে পারে। পুস্তক সূচীপত্রক একবার তৈরি হ'লেই কাজ শেষ হয়, তার মধ্যে আর অদল-বদল অথবা নূতন মালমশলা ঢোকাবার কিছু থাকে না। সাময়িকী সূচীপত্রকের বেলায় যতদিন পত্রিকার আয়ু ততদিন এই কাজ চ'লতে থাকে। শুধু নূতন সংখ্যা বা সম্পাদক বদল বা আকারের ইতরবিশেষই নয়,—মূল নামেরও পরিবর্তন হ'য়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, পুস্তক সূচীপত্রকের বিবরণ লেখা হয় প্রথম সংস্করণ ধ'রে, সাময়িকীর কাজ বহুলাংশেই সর্বশেষ খণ্ড নিয়ে। তৃতীয়ত, বইএর বেলায় সম্পাদক লেখকেরই অনুরূপ প্রধান স্থান নেন, সাময়িকীতে তার উল্লেখ গৌণ। কেবলমাত্র যৌথসূচীকরণ অথবা অন্যান্য বিশেষ বিষয়ানুবদ্ধ পত্রকের বেলাতেই উভয়ের কিছুটা মিল দেখতে পাই।

বাঁধাই—সাময়িকী বাঁধানোর ব্যাপারে প্রথমেই ছোটখাট কতকগুলি সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। সর্বাগ্রে পত্রিকার বিশেষত্ব এবং গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন কোনো গ্রন্থাগারই বোধহয় নেই যেখানে তাবৎ পত্রিকা বরাবরকার মতো মজুত রাখার দরকার হয়। যেগুলি বরাবর থাকবে সেগুলিকে পোক্ত ক'রে বাঁধিয়ে রাখাই উচিত। দ্বিতীয়ত, অনেক

ক্ষেত্রেই সমস্যা হয় মলাট ও বিজ্ঞাপনসমেত বাঁধানো হবে কিনা। কেননা, সাধারণ পাঠকের কাছে এগুলি মূল্যহীন হ'লেও বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির পক্ষে অনেক বিজ্ঞাপনের মজুতি বৈশিষ্ট্য থাকে। অথচ এই বাড়তি পাতা সমেত বাঁধানো হ'লে পত্রিকার আয়তন অকারণে বেড়ে যায়, ব্যবহার ক'রতে অসুবিধা হয়, অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর ভিড়ে দিশেহারা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিদেশে, এবং আমাদের দেশেও এমন পত্রিকা দেখা যায় যার মধ্যে বিজ্ঞাপনের ভার মূল বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে ওঠে। সেজন্য যেসব সংস্থার গ্রন্থাগার বিজ্ঞাপন সংরক্ষণের প্রয়োজন মনে করে তারাও তাবৎ বিজ্ঞাপন না রেখে বছরের প্রথম, শেষ ও মধ্যবর্তী সংখ্যার কিছু কিছু বিজ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েই কাজ চালাতে পারে, কেননা, দেখা যায় যে একই বিজ্ঞাপন সাধারণত বেশ কিছু সংখ্যা ধ'রে প্রকাশিত হয়। মলাট রাখা বা না রাখা সম্পর্কে অনেক কারণেই বিবেচনা ক'রে দেখতে হয়। তবে আজকাল বহু পত্রিকাই মূল রচনাংশের মধ্যেই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত ক'রে থাকে। সেক্ষেত্রে আর ক'রবার কিছু থাকে না। বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণের এই অভ্যাস প্রশংসনীয় নয়, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার পক্ষে। এর কোনো অংশ কখনো মাইক্রো-নকল ক'রতে হ'লে এজাতীয় অবান্তর সম্ভার জটিলতার সৃষ্টি করে।

প্রতি বছরের সব ক'টি সংখ্যা একত্র বাঁধিয়ে নিতে পারলে কাজের সুবিধে হয়। কিন্তু সব পত্রিকা বছর পুরলে বাঁধানো যায় না,—আয়তন বড় হ'য়ে যায়, ওজনে ভারি হয়। ব্যবহার ক'রতে যেমন বেগ পেতে হয় তেমনি তাড়াতাড়ি ছিঁড়েখুঁড়ে যাবারও ভয় থাকে। মাসিক পত্রিকা ছয় মাসে এক খণ্ড, সাপ্তাহিকগুলি তিন মাসে এবং দৈনিক সংবাদপত্র দু'মাসের হিসেবে সাধারণত বাঁধানো হ'য়ে থাকে। দৈনিক সংবাদপত্র মজবুত পুরু পাত বা বোর্ড দিয়ে চামড়ার বাঁধাই হওয়াই উচিত। এক একটি খণ্ড দুই তিন ইঞ্চির বেশি মোটা হ'লে ব্যবহারের বেলায় যেমন অসুবিধা তেমনি তাড়াতাড়ি নষ্ট হ'য়ে যাবার ভয়ও থাকে। এগুলি খাড়া ক'রে রাখাও ঠিক নয়,—দুমড়ে বেঁকে ভেঙ্গে যায়। একটার উপরে আরেকটা চাপিয়ে শুইয়ে রাখতে হয়। তবে একসঙ্গে অনেকগুলো চাপানোও চ'লবে না, তার ফলে নিজেদের ওজনে নিজেরাই জখম হ'য়ে যেতে পারে, কাগজে কাগজে সেঁটে বা ভঙ্গুর হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। সংবাদপত্রের পাতাগুলিও টেঁকসই নয়। তাই

বেশি দিন রাখবার প্রয়োজন হ'লে স্বচ্ছ কাগজ দিয়ে পাতাগুলি এঁটে (laminate ক'রে) নিতে পারলে ভাল। প্রথাটা অবশ্য খরচসাপেক্ষ। কিন্তু সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ ক'রলে এছাড়া আর কোনো মোক্ষম উপায়ও নেই। আজকাল অবশ্য মাইক্রোফিল্মের সাহায্যে এ ধরণের মাল-মশলা সংগ্রহ ক'রে রাখা সম্ভব হ'চ্ছে, এবং তার ফলে মজুতির অনেক সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাচ্ছে। এতে প্রাথমিক খরচ প্রচুর হ'লেও শেষ পর্যন্ত হরে-দরে হয়ত সেটা অতিরিক্ত ব'লে মনে হয় না। বাঁধানোর ব্যয় যেমন নেই তেমনি মজুতির খরচও কম। একটি ছোট মাপের তাকেই বেশ কয়েক বছরের সংবাদপত্র-প্রতিলিপি এঁটে যায়। কোনো কোনো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানও যেমন স্বতন্ত্র বিমান সংস্করণ তৈরি করে তেমনি মাইক্রোফিল্ম সংস্করণও তৈরি ক'রে থাকে।

পুরানো সংবাদপত্র সচরাচর বেশি ব্যবহৃত হয় না ব'লে এই উপায়ে সংগ্রহ ক'রে রাখা চ'লতে পারে। কিন্তু অন্যান্য পত্র-পত্রিকার বেলায় এতে নানান ব্যবহারিক অসুবিধা দেখা দেয়। সমগ্র সাময়িক পত্রসম্ভার মাইক্রোফিল্ম করার সার্থকতা নেই। প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ ফটোস্টাট ক'রে নেওয়া যেতে পারে। পড়বার সুবিধেও তাতে বেশি। ফোটোস্টাট রীডারের সাহায্যে পাঠোদ্ধার এবং কাজ যত সহজ পর্দায় প্রতিফলিত ক'রে মাইক্রোফিল্ম পাঠ তত সহজ নয়। আজকাল আবার এই মাইক্রোফিল্মের যুগে সংবাদপত্র বাঁধানোর প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু, সকলের পক্ষে ব্যয়াধিক্য ইত্যাদি নানা কারণে এই চিত্র-প্রতিলিপি রাখা সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন ছাড়াও একথা ব'লতে পারা যায় যে ফোটো-ফিল্ম নকলনবিশী কাজের জন্যও সংবাদপত্র বাঁধিয়ে রাখার দরকার হয়। কেননা, মাইক্রোফিল্ম থেকে নকল করা যায় না। তাবৎ সংবাদ-সংস্থা যদি মাইক্রোফিল্ম সংস্করণ প্রস্তুত করে, অথবা গ্রন্থাগারে যদি এই চিত্র-প্রতিলিপি গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে তবে আর সংবাদপত্র বাঁধানোর দরকার হবে না।

পত্রিকা বাঁধাই প্রকল্পের সুবিধা অসুবিধার প্রসঙ্গও কখনো কখনো খতিয়ে দেখতে হয়। বাঁধিয়ে রাখার যেসব উজ্জ্বল সুবিধের দিক আছে তার ফিরিস্তি সকলেরই জানা। সহজে ব্যবহার করা যায়, কোনো বিশেষ সংখ্যা খুঁজে বা'র ক'রতে বেগ পেতে হয় না, খুচরো সংখ্যাগুলো হারিয়ে যাবার বা ছটকে

যাবার ভয় থাকে না, পত্রিকাগুলি টেঁকে অনেকদিন, ইত্যাদি। কিন্তু অসুবিধার দিকও আছে। কোনো একজন যখন ব্যবহার করেন তখন অন্যরা বঞ্চিত হ'ন, অর্থাৎ কোনো একটি সংখ্যার জন্য সংবদ্ধ অন্যান্য সংখ্যাগুলি আটকে থাকে। আজকালকার গ্রন্থাগার-সহযোগের দিনে কোনো সংখ্যা যখন অন্যত্র পাঠাতে হয় তখন তাহ'লে সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি সংখ্যাও স্বভাবতই চ'লে যায়। পাঠাবার খরচও বেশি পড়ে, জখম হ'য়ে যাবার ভয়ও থাকে। পত্রিকা বাঁধাতে অনেক সময় লাগে ব'লেও সন্ধানসূত্রাদির কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে এর সবগুলি দূর ক'রবার কোনো উপায় নেই, বিশেষ বিশেষ সাময়িকীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন বুঝে ব্যবস্থার তারতম্য করা যেতে পারে।

পত্রিকা অন্য গ্রন্থাগারে ধার দেবার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। বিশেষত যেগুলি সাম্প্রতিক সংখ্যা সেগুলির বেলায়। পত্রিকা হাতছাড়া ক'রতে অনেকেই নারাজ হন। তাই বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ অংশের আলোকচিত্র-প্রতিলিপি বা ফোটোস্টাট নকল করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কোনো একটি সংখ্যা ধার দিতে গেলে পুরো একটি খণ্ডই হাতছাড়া হ'য়ে যায় ব'লে কোনো কোনো গ্রন্থাগার তাবৎ সংখ্যা একত্র না বাঁধিয়ে মাপ মতো একটি বাক্সে সেগুলি গুছিয়ে রাখে—যাতে প্রয়োজনমতো যে কোনো সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে ধার দেওয়া চলে। এই পদ্ধতিতে অবশ্য খুচরো সংখ্যা রাখার মূল সমস্যার কোনো সমাধান হয় না।

সাময়িকীর মধ্যে যেসব মানচিত্র থাকে সেগুলি অনেকেই আলাদা ক'রে মানচিত্র সংগ্রহের সঙ্গে রেখে দেন। এর ফলে মানচিত্রের ব্যবহার বিস্তৃততর হ'তে পারে। এক্ষেত্রে পত্রিকাগুলির মধ্যে এবং/বা সূচীপত্রকে নির্দেশ লিখে রাখা উচিত। কোনো কোনো সাময়িকী—যেমন National Geographic Magazine—স্বতন্ত্রভাবেই মানচিত্র সঙ্গে দেয়।

কোনো কোনো পত্রিকার ধরণধারণ আবার এমন বিচিত্র হয় যার মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বতন্ত্র পত্র নির্দেশে বিভিন্ন গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন, আড্যার গ্রন্থাগারের 'ব্রহ্মবিদ্যা' (Brahmavidya) পত্রিকা। এগুলির সমস্যা বিচিত্র রকমের। প্রকাশিত হ'য়ে যাবার পর পাতাগুলি খুলে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বই হিসেবে বাঁধিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য। ফলে পত্রিকাটিই বৎসরান্তে লুপ্ত হ'য়ে যায়।

কোনো কোনো সাময়িকী কিছুকাল পরেই, অথবা একই বছরের মধ্যে আকারে তারতম্য ঘটিয়ে থাকে। এগুলি একসঙ্গে বাঁধাতে গেলে মুস্কিলে প'ড়তে হয়। ফর্মার মাপ অনুযায়ী স্বতন্ত্র পর্যায়ে বাঁধানো ছাড়া উপায় থাকে না।

সন্ধানসূত্র, প্রবন্ধসার—সাময়িকীর প্রধান কাজ সমসাময়িক চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠকদের পরিজ্ঞাত রাখা। কিন্তু আজকের দিনে কোনো একজন ব্যক্তি—এমন কি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও পৃথিবীর সমগ্র জ্ঞানক্ষেত্র অথবা সমগ্র সাময়িকীর সংগ্রহ বা সন্ধান রাখা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনা। সুতরাং বিষয়ওয়ারী ভাবে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ যদি গ'ড়ে তোলা যায় তবে নানান দিক থেকে সুবিধা হ'তে পারে। অর্থাৎ যৌথ বা সমবায় ভিত্তির পত্তন। এই ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির খরচ যেমন আয়ত্তাতীত হ'য়ে ওঠে না, তেমনি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহও একই গ্রন্থাগারে না হ'লেও একই এলাকায় গ'ড়ে তোলা সম্ভব হয়। তবে তাতেও যে সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় তা নয়। বিভিন্ন বিষয়ের মতো বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকী প্রসঙ্গও আছে, এবং এর জন্য অনুবাদকের সাহায্য প্রয়োজন। তাহ'লে যৌথভাবে অনুবাদক নিয়োগের কথা ভাবতে হয়। দ্বিতীয়ত, বছরের পর বছর পত্রিকার পুঁজি বেড়ে চলে। সেগুলিতে যত রকমের প্রবন্ধ থাকে তার সবগুলিই এমন কিছু বই হ'য়ে বেরোয় না। বেরোলেও বিলম্বে।

সুতরাং এই সমস্ত দিকে নজর রেখে এবং সব কিছুকেই আওতার মধ্যে এনে তালিকাভুক্ত ক'রে রাখা দরকার। তালিকা বা সূচী প্রস্তুতির কাজ সাময়িকী বিভাগের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে মনে করা যেতে পারে। লেখক, প্রবন্ধ শিরোনাম, বিষয়, প্রকাশের বিবরণ,—ইত্যাদি অনুক্রমে তালিকা তৈরি ক'রতে হয়। একাজের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকে, যৌথ পত্রিকা-তালিকা প্রণয়ন যার প্রধান কাজ। কেবলমাত্র বিষয়াদির নির্দেশই নয়, গবেষকদের সুবিধার জন্য এবং শ্রমলাঘবের জন্য প্রবন্ধসার বা abstract তৈরি করার কাজও আজকাল অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। এ জাতীয় সারসংগ্রহের কিছু স্বতন্ত্র পত্র-পত্রিকার প্রচলনও আছে। সাময়িকীর জগৎ এত বিশাল যে অনেকে মিলে যৌথভাবে সূচী, তালিকা, সারসংকলন, আলোকচিত্র-প্রতিলিপি প্রভৃতি কাজে হাত দিলে বিশেষ কোনো একটি সংস্থার উপরে চাপ পড়ে না। মূল পুস্তক সংগ্রহে যেমন গ্রন্থাগারিকের কাজ দ্বিবিধ,—বইগুলির যথাযথ বিন্যাস বা

সংরক্ষণ এবং তার আভ্যন্তরীণ বিষয়সম্ভার পাঠকের কাছে উপস্থাপন, তেমনি সাময়িকীর বেলাতেও তাঁর কাজ দ্বিবিধ। এক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও বিন্যাসের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বিষয়তালিকা, বিষয়সূচী, গ্রন্থপঞ্জী, সার-সংকলন ইত্যাদির কাজ। বই-এর বেলায় যেটা বিষয়সূচী, পঞ্জী প্রভৃতিতে বিন্যস্ত, সাময়িকীর সূত্রে সেই তথ্যপরিবেশন আরো বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে তুলতে হয়।

সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সারসংকলনের কাজ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো বাঞ্ছনীয়। কেননা, কোন্ অংশ গৃহীত হবে, কতটুকু বর্জিত হ'লেও মূল প্রবন্ধের বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হবে না, কোন প্রসঙ্গটি বিষয় গৌরবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ—তার নির্ধারণ তিনিই ক'রতে পারেন যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি জানেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রবন্ধসার থেকেই গবেষক তাঁর প্রয়োজনীয় মাল-মশলা পেতে পারেন, বা কতটুকু পাবেন বুঝে নিতে পারেন। প্রবন্ধসার সংকলনের কাজ বিষয়ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন,—পত্রিকা-প্রসঙ্গের স্থান গৌণ। মূল বিষয় নির্দেশের পরে লেখকের নাম, প্রবন্ধ শিরোনাম, পত্রিকার নাম ও সংখ্যার নির্দেশ বর্ণানুক্রমিক হ'তে পারে। Social science abstract, Indian educational abstracts প্রভৃতি যেমন বিষয়ানুগ, তেমনি আবার Readers Digest, নবনীত (হিন্দী), অনন্য (বাংলা) প্রভৃতি কিছু কিছু সাধারণ পত্রিকাতেও নানাবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সার সংকলিত হ'তে দেখা যায়।

আরেক ধরণের সাধারণ সূচী বা নির্দেশক তালিকাও আছে যা সন্ধান সহায়ক। এতে বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ শিরোনাম ও লেখকের উল্লেখ থাকে। এর বিন্যাস লেখক ও শিরোনাম নির্বিশেষে বর্ণানুক্রমিক হ'তে পারে। এই তালিকা পুস্তকাকারে ছাপিয়ে রাখা যায়, পত্রকাকারে খোপে সাজিয়েও রাখা যায়। প্রথমটি বাইরের গ্রাহকরাও সংগ্রহ ক'রতে পারে, দ্বিতীয়টি গ্রন্থাগারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। গবেষকরা এর থেকে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের খোঁজ পান। বৎসরান্তে পত্রিকায় যে বার্ষিক সূচী বেরোয় এটি তারই সমগোত্রীয়। তবে এতে কেবলমাত্র প্রবন্ধের নাম না দিয়ে অল্প দু'চার কথায় বিষয় বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ঐ সঙ্গে, অর্থাৎ লেখক ও শিরোনামের সঙ্গে বিষয়-নির্দেশক পত্রক বা subject card রাখা উচিত।

এই সূত্রে নথিনিবেশ বা documentation কর্মের উল্লেখ করা যায়। নথিনিবেশের কাজ বই ব্যতীত যাবতীয় প্রকাশিত অপ্রকাশিত পত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি গবেষকদের জ্ঞাতব্য তথ্যের সংরক্ষণ। বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক শিল্প-শ্রেণীয় বিষয়ের সাম্প্রতিকতম খবর বা মালমশলার প্রকাশক কেবলমাত্র সাময়িকী-গুলিই নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংক্রান্ত বিবৃতি বা ব্যবহারিক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদির বিজ্ঞপ্তি বা কর্মসূচীও গবেষকদের কাজে লাগে। অথচ এগুলির কোনো সংগ্রহধারা থাকে না। এসব ক্ষেত্রে নথিনিবেশই একমাত্র সম্বল। প্রবন্ধাদির সারসংকলন, তালিকা-করণ থেকে সুরু ক'রে আলোকচিত্র-প্রতিলিপি, মাইক্রোফিল্ম, বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ—সবই এর আওতায় পড়ে। INSDOC-জাতীয় নথিনিবেশ-কেন্দ্রের কাজ কী পরিমাণ ব্যাপক তা সকলেরই জানা আছে।

প্রকরণ বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি—এবারে সাময়িকীর সম্ভার-বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা ক'রে এই অধ্যায় শেষ করব। নিবন্ধারম্ভে যে শ্রেণী ভাগ ক'রেছি তার মধ্যে দৈনিক থেকে সুরু ক'রে বার্ষিক পত্রিকা পর্যন্ত সাধারণ সাময়িকী গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। এর পরের শ্রেণীতে আছে নানান বার্ষিকী বা বর্ষপঞ্জী এবং পঞ্জিকা। এই বার্ষিকীর মধ্যে আছে বাংলা বর্ষপঞ্জী, স্টেট্স্‌ম্যান বা হিন্দুস্থান বা নালন্দা ইত্যাদি শ্রেণীর বার্ষিক প্রকাশন, India, Annual Register ইত্যাদি শ্রেণীর বই, এবং Thacker's Directory শ্রেণীর কিছু তথ্যনির্দেশপঞ্জী,—যেগুলি নিয়মিতভাবে বার্ষিকী হিসেবে প্রকাশিত নাও হ'তে পারে। এইসব গ্রন্থ অবশ্য সাধারণত গ্রন্থাগারের সাময়িকী বিভাগে রাখা হয় না, তথ্যসন্ধান বা reference কক্ষে থাকে। অথবা বিশেষ পাঠকক্ষে (reading room) রাখা হয়। এবং সাধারণ গ্রন্থের মতোই বর্গীকৃত, সূচীকৃত ও মঞ্চস্থ করার রীতি। কিন্তু Keesings Archives অথবা Asian Recorder জাতীয় সংবাদ-সাময়িকী সাময়িকী বিভাগে থাকাই বাঞ্ছনীয়,—অন্ততপক্ষে চলতি বছরে তো বটেই। কেন না এগুলি প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি পক্ষে এবং মাসিক ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ধাপে ধাপে পত্রিকারই মতো আত্মপ্রকাশ করে। বর্ষপূর্তির পর এগুলিকে বার্ষিকীর মতোই মূল গ্রন্থরাজির সামিল ক'রে নেওয়া যায়।

কিন্তু সাময়িকী বিভাগে সমস্যার সৃষ্টি করে সভা সমিতি ইত্যাদির

প্রতিবেদন, সরকারী বিবৃতি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানাদির বিবরণ, এবং স্মারক পুস্তিকা। সাধারণত এগুলির প্রকাশ অনিয়মিত। অথচ এগুলিকে সরাসরি মূল সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করাও যায় না। কিন্তু শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়, এমন কি অপরিহার্যও। এই জাতীয় সামগ্রীর শ্রেণীবিন্যাস মূল গ্রন্থরাজির অনুসরণে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সরকারী বিবৃতি সূচীকরণের বিশেষ প্রকল্পও বর্তমান। স্মারক শ্রেণীর পুস্তিকাদি সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা স্থির ক'রে নিতে হয়। অর্থাৎ, কোন্ গ্রন্থাগার কোন্ ধরণের মাল-মশলা দরকারী ব'লে মনে ক'রবে এবং জোগাড় ক'রবে, অথবা কোনটা কতদিন পর্যন্ত রাখা যুক্তিযুক্ত তা স্থির ক'রে নেওয়া দরকার। নচেৎ এগুলি বাড়তে বাড়তে জঞ্জালের স্তূপ জ'মে উঠবে।

বিভিন্ন ধরণের সভা-সমিতির প্রতিবেদন স্বভাবতই গ্রন্থাগারে এসে জমা হয়। রাজনীতিক, শিক্ষা ও বিনোদন সংক্রান্ত, অথবা সাংস্কৃতিক—হরেক রকমের সম্ভার। এগুলিকে স্মারক পুস্তিকার পর্যায়ে ফেলাও কঠিন, আবার বিশেষ পুস্তিকা (pamphlet) হিসেবেও গণ্য করা যায় না। অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে কী ধরণের চিন্তা বা কাজকর্ম চ'লছে তার বিবৃতি এর থেকে মেলে। সমাজের একটা চিত্র বা রূপ এগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে। তাই এর মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় বিবরণগুলি, অর্থাৎ গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট ধারা বা আদর্শ অনুযায়ী সামগ্রী বাছাই ক'রে নিয়ে বিষয়ওয়ারী ভাবে নথিভুক্ত বা খোলা বাক্সজাত ক'রে রাখা চলে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কেও এই একই নিয়ম অনুসরণ করা যায়।

স্মারক-পুস্তিকা বা Souvenir একটু স্বতন্ত্র ধরনের প্রকাশন। কেননা, এতে যেমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে সভা অথবা অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকে তেমনি বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধও কিছু থাকে। যেমন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, গ্রন্থাগার সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন, অথবা রবীন্দ্র জন্মোৎসব, বিবেকানন্দ জন্মোৎসব ইত্যাদি। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই সেই নামের ক্রমানুসারে পুস্তিকাগুলি নথিজাত ক'রে রাখা যায়, এবং সেই অনুযায়ী তালিকাও ক'রে রাখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলিকে গ্রন্থসংখ্যাভুক্ত ক'রেও নেওয়া চলতে পারে। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই তা হ'য়ে ওঠে। মাল-মশলা অনির্দিষ্ট ব'লেই এগুলিকে স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র এক ধরণের সাময়িকী হিসাব গণ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায়

থাকে না। স্মারক-পুস্তিকা বিষয়ওয়ারী বিন্যাসেও নথিজাত ক'রে রাখা যায়। এই ধরণের সম্ভার নিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকে একটু বিব্রত হ'তে হয় সন্দেহ নেই। তবু বিশেষ বিশেষ অনুশীলনের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে এদের অবহেলা করাও যায় না।

আরেক ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ বিবরণী। যেমন শিক্ষাসারনি বা prospectus, বার্ষিক বিবৃতি, সমাবর্তন ভাষণ, শিক্ষাপ্রসার বক্তৃতামালা বা extension lectures, ইত্যাদি। এগুলি সংখ্যায় প্রচুর, অথচ কোনোটাই বাতিল ক'রবার মতো নয়,—বিশেষ ক'রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের পক্ষে। অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগার এগুলির গ্রহন বর্জন বিষয়ে খতিয়ে দেখতে পারে। শিক্ষাসারণি, বার্ষিক বিবৃতি বা পঞ্জী মূল বর্গপদ্ধতি অনুসারে সংগ্রহভুক্ত ক'রে রাখা যায়। কিন্তু সমাবর্তন ভাষণ প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তিকা নথিজাত ক'রে গুছিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষাপ্রসার বক্তৃতামালা বিষয়ানুক্রমে গুচ্ছবদ্ধ ক'রে—এমনকি বাঁধিয়েও রাখা যেতে পারে। এগুলির ব্যবহারিক মূল্য কেবলমাত্র সাময়িক নয়।

পুস্তিকা—এতক্ষণ যে ধরনের সাময়িকের কথা বললাম সেগুলি পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র তো বটেই, এবং একই শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হ'য়েও কোনোটা বই-এরই মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ বা তথ্যনিদানে বিশিষ্ট, কোনোটা বা সমসাময়িক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ,—অর্থাৎ কতকগুলি বরাবরের মতো সঞ্চয় ক'রে রাখবার উপযুক্ত, কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ের পরেই পরিত্যাজ্য। কিন্তু পুস্তিকা বা pamphlet কিছুটা অভিনব। এবং গ্রন্থাগারিকের কাজে কিঞ্চিৎ জটিলতার সৃষ্টি করে। পুস্তিকা পত্রিকারই মতো সাময়িক চিন্তা ও জ্ঞান সম্ভারে বৈশিষ্ট্যের দাবি যেমন রাখে, তেমনি আবার সময় ফুরোলে বোঝা হ'য়ে ওঠে। এমন অনেক পুস্তিকা আছে, যেমন ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, Oxford Pamphlet Series, বা নবজীবন প্রকাশন বা Pendle Hill, Forum of Free Enterprise, ইত্যাদি, যেগুলি বই-এর মতো স্থায়ীভাবে রাখার উপযুক্ত। অথচ এগুলি এত ছোট যে আলাদা ক'রে বই হিসেবে রাখাও নিরাপদ নয়। এগুলিকে বিষয় অনুসারে গুচ্ছবদ্ধ ক'রে বাঁধিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু বিষয়, লেখক, শিরোনাম সবই আলাদা ব'লে শ্রেণীবদ্ধতার কাজ জটিল হ'য়ে পড়ে। সূচীকরণেও অনেক বিশ্লেষ-পত্রক (analytic card)

তৈরি ক'রতে হয়। তবুও এভাবে সাজিয়ে রাখা বোধহয় ভাল। এর পরিবর্তে না বাঁধিয়ে শ্রেণীগত ভাবে বাক্সজাত ক'রেও রাখা যেতে পারে।

যেসব পুস্তক-পুস্তিকা ৩২ পৃষ্টার কম সেগুলিকে বই হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারো মতে ৫০ পৃষ্ঠা হওয়া বিধেয়। কারো মতে আবার আরো কম হ'লেও এসে যায় না। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের ভারেই পুস্তকত্ব বিচার। বিষয়ের গুরুত্বে বা লেখার বিশেষত্বে, অথবা লেখকের কৌলিন্যে মর্যাদার নির্ধারণ। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের বিবেচনাই চূড়ান্ত। কোন্‌গুলি অপ্রাসঙ্গিক, কোন্‌গুলি আবশ্যিক, কোন্‌গুলি সাময়িক মূল্যের তা তিনিই স্থির করবেন। পুস্তিকা-সম্ভার সাধারণত এমন সব বিষয় নিয়ে বাজারে হাজির হয় যেগুলি উপেক্ষণীয় নয়। পত্রিকাদির প্রবন্ধের মতো এগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে গ্রন্থভুক্ত হ'য়ে থাকে। গ্রন্থভুক্তিতে দেরি হয়, কোনোটা বা গ্রন্থ হিসেবে আর প্রকাশিতই হয় না। সুতরাং এ জাতীয় সামগ্রীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

পুস্তিকারাজিও সাময়িকী বিভাগে বিষয়ানুবদ্ধ ভাবে, অথবা বৎসরের ধারা অনুসারে সাজিয়ে রাখা সঙ্গত। এজন্য মোটা কাগজ বা বোর্ডের খোপ তৈরি ক'রে নেওয়া যেতে পারে। আবার বিশেষ ধরনে বানানো আসবাবেও ক্রমানুসারে রাখা যেতে পারে। একেকটি নির্দেশকপত্র বা guide card সংযোগে একেক শ্রেণীর পুস্তিকার গোছা সাজিয়ে রাখার উপযুক্ত আসবাব বাজারে চালু আছে। কোন্ পুস্তিকা কতদিনের জন্য সাময়িকী পাঠকক্ষে প্রদর্শিত থাকবে, এবং কোন্‌গুলিকে পরে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রন্থ হিসেবে বাঁধিয়ে রাখতে হবে তাও বিবেচনা ক'রবেন গ্রন্থাগারিক,—তাঁর গ্রন্থাগার ও পাঠক গোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রেখে। না বাঁধিয়ে যদি চটি বই হিসেবে মঞ্চস্থ ক'রতে হয় তবে অন্যান্য গ্রন্থরাজির সঙ্গে না রেখে স্বতন্ত্র পর্যায়ে রাখাই সঙ্গত, নচেৎ এগুলি জখম হ'য়ে বা হারিয়েও যেতে পারে। খুব বড় বা খুব ছোট মাপের বই যেমন স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিন্যাস বিধেয়, পুস্তিকার ক্ষেত্রেও তেমনি করা উচিত।

যে সব সাময়িকী বিশেষ কোনো ধারা বা ক্রম ধ'রে প্রকাশিত হয় সেগুলির সাংগঠনিক পরিচালনার কাজ সহজ,—একটা নির্দিষ্ট ধারায় চলা যায়। অনিয়মিত প্রকাশনের মধ্যেও সরকারী বিবরণীসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ক'রতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু স্মারক বা পুস্তিকা শ্রেণীর মুদ্রিত সম্ভার নিয়ে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। এর মধ্যেও আবার যেগুলি গ্রন্থমালা বা series হিসেবে বেরোয় সেগুলিকে

বাঁধিয়ে হোক বা গুচ্ছক্রমে ফুঁড়ে গেঁথে রেখে হোক, অথবা বিশেষ বাক্সের আকারে খোপ বানিয়ে তার মধ্যে পরম্পরাক্রমে সাজিয়ে হোক,—একটা কোনো সুসংবদ্ধ পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। এগুলির সূচীপত্রক তৈরির কাজও কঠিন নয়; গ্রন্থমালা, লেখক, গ্রন্থনাম,—এই তিন কিস্তিতে বিন্যাস কার্যকর। কিন্তু যে সব খুচরো প্রকীর্ণ পুস্তিকা স্বতন্ত্রভাবে ছাপানো হয়,—যাদের বিষয়-বৈভব অবহেলার যোগ্য নয়, এবং যেগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণের মূল্য সাময়িক, কিছু বা স্থায়ী,—সেই সব পুস্তিকা নিয়ে গ্রন্থাধ্যক্ষ একটু গণ্ডগোলে পড়েন। তবে সব সামগ্রীই বাক্সের খোপে অথবা আলগা বোর্ডের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে রেখে দেওয়া যেতে পারে। এতে যেমন যে কোনো একটি পুস্তিকা পাঠকের প্রয়োজনে আলাদাভাবে বা'র ক'রে নেওয়ার সুবিধে, তেমনি কোনো পুস্তিকা ভবিষ্যতে বর্জন ক'রতে হ'লেও জটিলতার সৃষ্টি করে না। বাইরের কোনো পাঠককে পাঠাতে হ'লেও সুবিধে। পুস্তিকা সম্ভারের সূচীকরণ অবশ্য বই-এর সূচীকরণ-পদ্ধতিতে হওয়াই কার্যত সুবিধের। তবে তা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এগুলির বর্গবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে যদি গ্রন্থাধ্যক্ষ মনে করেন তবে সে কাজ বিশদ না হওয়াই ভাল। খুঁটিনাটি বিভাজনের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি বর্গসংখ্যাটুকুর উল্লেখই যথেষ্ট।

অস্থায়ী সাময়িকীর গ্রহণ বর্জন প্রকল্প নিয়মিত হওয়া দরকার, নচেৎ স্তূপ জমে গেলে কূল মেলা কঠিন। কালের বিচারে অথবা গ্রন্থভুক্ত হ'য়ে যাবার পর যে সব সামগ্রী অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে সেগুলি বাতিল ক'রে না দিলে শুধুশুধু ভার বাড়ে, বাছাই ক'রতে যত সময় যায় তত পরিশ্রম। সেজন্য স্বভাবতই সমসাময়িক হালচাল সম্পর্কে গ্রন্থাগারিককে সতর্ক অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রতে হয়। গ্রন্থের চেয়েও সাময়িকীর কাজ তাই বেশিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থাগারে প্রচার

প্রচারের কী ও কেন—প্রসঙ্গটা নামমাত্রেই কৌতূহলের উদ্রেক করে। কিম্বা বিস্ময়ের। গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্গে প্রচারের যোগ কিসের? জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগার। জ্ঞানের আবার প্রচার কি জন্যে প্রয়োজন? জ্ঞান কি পণ্যসামগ্রী যে বিজ্ঞাপন জাহির ক'রে খদ্দের ধ'রে আনতে হবে?

আসলে প্রচারটা তো জ্ঞানের নয়,—ভাণ্ডার সামগ্রীর। বিদ্যা আহরণের আহ্বান,—বই যার মাধ্যম। গ্রন্থাগার বই-এর আড়ৎ। বই বেচাকেনার আড়ৎ নয়। সংগ্রহ। এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য যাতে লোকে এখানে আসে, প'ড়ে, জ্ঞান সঞ্চয় করে।

কিন্তু জ্ঞান সঞ্চয়ের আগ্রহ বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন যাদের আছে তারা তো গ্রন্থাগারে আসবেই। আর যাদের দরকার নেই তারা আসুক বা না আসুক তাতে কী বা এসে যায়। একথা স্বভাবতই মনে হ'তে পারে। তাই প্রসঙ্গটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখা সঙ্গত।

কোনো পণ্যসামগ্রী বিজ্ঞাপনের সহায়তায় প্রচার করার বেলায় যেমন কে কিনবে বা কিনবে কিনা না ভেবে লোককে জানানো এবং সম্ভাব্য ক্রেতাকে আকৃষ্ট করাই কাজ, গ্রন্থাগারের বেলাতেও ব্যাপারটা বলতে গেলে সেই রকমই।

যারা জানে কী প'ড়তে হবে, কোন বিষয়টি কোথায় মিলবে, গ্রন্থাগারের ধরণ-গড়ন কীরকম, তারা এমনিতেই আসে তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাদের কাছেও গ্রন্থাগারের সম্পদ বা বৈশিষ্ট্য বা নূতন সংযোজন ইত্যাদির বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে দিতে হয়। আর যারা জানেনা অথচ জানতে চায়, কিম্বা হয়তো জানবার তেমন চাড় নেই অথচ প্রবৃত্তি আছে, কিম্বা একেবারেই অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ, তাদেরও জ্ঞানের বা শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হয়। দায়িত্বটা এড়াবার নয়। এই জন্য কোনো এক ধরণের প্রয়াস প্রয়োজন। এই প্রয়াসকেই বলতে পারি প্রচার।

প্রশ্ন হ'তে পারে, তাদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসবার জন্যই বা মাথা ব্যথা কিসের? উত্তরে বলা যায়, আজকের দিনে যেখানে সারা পৃথিবীতে মানুষের

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত, গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, ব্যক্তি নির্বিশেষে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নেই, সেখানে স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কেউ বঞ্চিত থাকবে একথা ভাবা যায় না। যে দেশের লোকসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশও অশিক্ষিত অবহেলিত থাকে সে দেশ সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, জীবনধারণের মানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। পিছিয়ে প'ড়ে থাকে। এই জন্যই অন্যান্য সামগ্রীর মতো শিক্ষার উপকরণও তাদের আওতায় এনে হাজির করা আবশ্যক।

গ্রন্থাগারের ধরন মোটামুটিভাবে দুই রকম, সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার। বিশেষ গ্রন্থাগার আবার শিক্ষালয়, গবেষণাকেন্দ্র প্রভৃতি নানান পর্যায়ের হ'য়ে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমকেন্দ্রিক পুস্তকের ব্যবস্থা থাকে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাঠক্রমের বহির্ভূত ও পরিপূরক গ্রন্থপাঠের আগ্রহে ও প্রয়োজনে একমাত্র গ্রন্থাগারই সহায়ক। গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষালয়ের ব্যাপ্তি, শিক্ষাকে ব্যাপকতর ক'রে তোলা। তেমনি সাধারণের,—সর্বসাধারণের চাহিদা মেটাবার এবং জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের কেন্দ্র সাধারণ গ্রন্থাগার। বিবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেসব গ্রন্থাগার যুক্ত থাকে সেগুলির সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক হ'লেও জ্ঞানকেন্দ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলিকে কোনো না কোনো ভাবে জনগণের সেবাধর্মী বলতে আপত্তি হবার কারণ নেই। সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে তো জনগণেরই সম্পর্ক—ছাত্র অ-ছাত্র নির্বিশেষে। তাই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের নানান উপায়ের কথা সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারিককেই ভেবে দেখতে হয়। কী বলতে বা বোঝাতে হবে, এবং কেমন ক'রে ব'লতে বা বোঝাতে হবে সেই প্রকল্পই জনসংযোগ (public relation) এবং এই যোগাযোগের উপকরণই প্রচার (publicity)।

প্রচারের ভিত্তি—রঙ্গনাথন-কৃত গ্রন্থাগারের পঞ্চনীতির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ব'লছে, পুস্তকমাত্রেই ব্যবহারের জন্য (books are for use), প্রতিটি পাঠকের উপযোগী বই চাই (every reader his book) এবং প্রতিটি পুস্তকের জন্য পাঠক (every book its reader)। এই নীতিগুলির উপর, বিশেষ ক'রে তৃতীয়টির উপর নির্ভর ক'রে গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থসম্পদের কথা প্রত্যেকের গোচরীভূত করতে হয়। প্রচারের সূত্রপাত এই থেকেই। কেউ এসে হয়ত ব'লতে পারে, আরে! আপনার গ্রন্থাগারে সংগীত সম্পর্কে এত সব ভাল ভাল

বই আছে দেখছি! কিম্বা, বটতলা সংস্করণ সব বই যে এখনো মেলে তা তো জানা ছিল না! অথবা, আপনার গ্রন্থাগার ছুটির দিনেও খোলা থাকে জানতাম না তো! এই ধরনের প্রশ্ন যাতে কাউকে ক'রতে না হয়, গ্রন্থাগার সম্পর্কে সকলে যাতে অবহিত থাকে, সে দিকে গ্রন্থাগারিককে নজর রাখতে হয়। এবং নানাবিধ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি ক'রে গ্রন্থাগারকে সর্বসাধারণের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে গ'ড়ে তুলতে হয়।

প্রচারবিধি দু'রকমের হ'তে পারে। সাধারণ প্রচার ও বিশেষ প্রচার। সাধারণ বা সাদামাটা ভাবে প্রচারের ধরনটা সোজাসুজি, ব্যাপক তার ক্ষেত্র যেমন, 'আরও ফসল ফলাও', অথবা 'জনগণের সম্পত্তি তোমারই সম্পত্তি, নষ্ট করিয়োনা'। কিম্বা সরকারী কোনো প্রকল্পের অথবা বেসরকারী কোনো আয়োগের বিবরণ বা বিজ্ঞাপন। গ্রন্থপক্ষে তার ধরন নিম্নোক্তরূপ হ'য়ে থাকে। :—(১) বই পড়ার মূল্য; বই কেন পড়া উচিত এবং কী এর উপকারিতা। (২) গ্রন্থাগারই জনসাধারণের শিক্ষাকেন্দ্র; গ্রন্থাগার কিভাবে শিক্ষার প্রসারে ও উপচারে সহায়তা করে। (৩) জনসেবায় গ্রন্থাগার; যেকোনো শ্রেণীর লোক এসে কিভাবে গ্রন্থাগার থেকে তথ্যাদি আহরণ করতে পারে, দৈনন্দিন এবং কর্মজীবনের সমস্যার সমাধানের খোরাক পেতে পারে। (৪) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানাবিধ ইতিবৃত্ত।

এ জাতীয় প্রচারের ধরনটা ব্যাপক, সর্বাশ্রয়ী। এই সূত্রগুলিকে ভিত্তি ক'রে দেশবাসীকে গ্রন্থাগার-সচেতন এবং গ্রন্থপাঠে আগ্রহী ক'রে তুলতে পারা যায়। সাক্ষরদের জন্য প্রবন্ধ রচনা, সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের জন্য সমাবেশ-বক্তৃতা, বেতার ভাষণ, দেয়াল চিত্র বা আলোক চিত্রাদি প্রদর্শন, বিবিধ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। কাজটা গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষাবিদ্ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। শিক্ষাপ্রসারই এর উদ্দেশ্য।

বিশেষ প্রচার, অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থাগারের বিশেষ কোনো গ্রন্থসংগ্রহের প্রচারকে দু'টি ধারায় ভাগ করা যেতে পারে। বহিরঙ্গ—অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সীমানার বাইরে প্রচার, এবং অন্তরঙ্গ—অর্থাৎ গ্রন্থাগারের ভিতরে প্রচার। বাইরের প্রচার নানাবিধ বিজ্ঞাপনে, স্থানীয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ও বিজ্ঞপ্তি ইস্তাহার প্রভৃতি (hand bill) বিলি ক'রে, গ্রন্থাগারের প্রচারপত্র (bulletin) প্রকাশে, এবং ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হ'তে পারে।

কোনো গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে,—অথবা বলা ভাল, গ্রন্থাগার যে অঞ্চলে অবস্থিত তার পরিবেশ বা আওতায় কোন কোন অংশে বা কী কী উপায়ে গ্রন্থাগার-সম্পদ কাজে লাগতে পারে তার বিশেষ প্রচারই এর উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞাপনে প্রচার—স্থানীয় সংবাদ পত্রাদির সঙ্গে নানা কারণেই গ্রন্থাগারের, বিশেষ ক'রে জনগ্রন্থাগারের যোগ বা বোঝাপড়া থাকলে ভাল। কেননা, গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানাবিধ বিবৃতি এবং বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়। সর্বসাধারণের কাছে খবরাখবর ও বক্তব্য বিষয় পৌছে দেবার এর চেয়ে ভাল মাধ্যম আর নেই। গ্রন্থাগারের প্রদর্শনী অথবা বিশিষ্ট কোনো সংগ্রহের সংবাদও এভাবে সকলের কাছে হাজির করা যায়। গ্রন্থাগারের সুনাম এবং দক্ষতার নজির হিসেবেও এই প্রচার প্রয়োজন। এ ছাড়া শহরের কোনো ক্লাব বা টাউন হল, সিনেমা হল, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, মহিলা সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গ্রন্থাগারের খবর বিজ্ঞপ্তিতে বা পুস্তিকার আকারে পৌছে দিতে হয়। এই সব কাজের সুবিধার জন্য জনসাধারণের গ্রন্থাগারিকের উচিত তাঁর গ্রন্থাগার-পরিমণ্ডলের,—অর্থাৎ যে অঞ্চলে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত সে অঞ্চলের এবং তার আওতার অন্তর্ভুক্ত এলাকার একটা জরীপ ক'রে নেওয়া। এই জরীপে বিবিধ পরিসংখ্যান, শিক্ষিতের হার, স্কুল-কলেজের হিসাব, শিল্প বা কুটির শিল্পাদির হিসাব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এবং এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক তাঁর সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হবেন, স্থির ক'রবেন প্রচার ও প্রসারের প্রকল্প। রেডিয়ো এ জাতীয় প্রচারের এক উত্তম মাধ্যম। নানাবিধ বেতার বক্তৃতাই শুধু নয়, গ্রন্থাগার পরিকল্পিত ও পরিচালিত নানাবিধ অনুষ্ঠানও বেতারে প্রচারিত হ'তে পারে। তবে আমাদের দেশের বেতার কর্তারা এ ব্যাপারে অবহিত বা সচেতন নন। মনে হয়, সরকার পক্ষীয় প্রচার ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক মামুলি কাহিনী আর ফিরিস্তি ছাড়া অন্য দিকে তাঁদের চিন্তা ধাবিত হয় না। গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতায় যদি এঁরা কিছু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন তা হ'লে কেবল যে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থবিষয়ে সকলে উৎসুক-ওয়াকিবহাল হ'তে পারে তাই নয়, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং সমাজবিন্যাস ও দেশ-বিষয়ক বহু দিকে তাদের চেতনা বিস্তৃত হ'তে পারে। স্কুল কলেজের স্তর থেকে সুরু ক'রে সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেরই উপকারে লাগে।

কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে শহরের সর্বত্র বিজ্ঞাপন বিলি ক'রতে হয়, বা সিনেমাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন ঘ'টতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো কিছু সকলকে জানাবার এটি ভাল উপায়। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং নূতন সংযোজন প্রচারের জন্য গ্রন্থাগার পত্রিকা (bulletin) প্রকাশ করা উচিত। এই পত্রিকা হয়ত মাসে একবার ক'রে মাত্র বা'র করা সম্ভব। তাই অন্তবর্তীকালের জন্য উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই সব বিজ্ঞপ্তি কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ দিনকে কেন্দ্র ক'রে প্রস্তুত করা যায়। যেমন, কোনো মনীষীর জন্মবার্ষিকী বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে গ্রন্থাগারিক তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের কথা জাহির করলেন। অথবা কোনো প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রে সেই খবর সকলের কাছে পৌছে দিলেন। এভাবে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহী ক'রে তোলা সম্ভব।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ—গ্রন্থাগার যেহেতু সমাজ শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র সেহেতু গ্রন্থাগারিককে সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। তাঁর পরিমণ্ডলের, অর্থাৎ সীমাভুক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সম্পর্কে সবরকমের তথ্য তাঁর জেনে রাখা দরকার। এবং তারই ভিত্তিতে সকলের সঙ্গে কোনো না কোনো ধরনের সংযোগ স্থাপন ক'রে তাদের চাহিদা বা প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাদীক্ষা, পড়াশোনা ইত্যাদি ব্যাপারে যাতে সাহায্য হয় সে রকম ব্যবস্থা করা উচিত। উপরোক্ত উপায়গুলি ছাড়াও ব্যাক্তিগত ভাবে নানান শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে চলা ভাল। গ্রন্থাগারকর্মীর কাজ আসলে সর্বসাধারণের সাহায্যে এগিয়ে আসার কাজ। তাই কেবলমাত্র বই দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে, কিম্বা গ্রন্থাগার-সজ্জার বিবিধ উপকরণের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করা সঙ্গত নয়। কাজটাকে সমাজ সেবার অঙ্গ ব'লে ধ'রে নিতে হবে। একাজ ব্যক্তিগত আদান-প্রদান, উপযোগী বক্তৃতা এবং কোনো সমাবেশে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে যেমন হ'তে পারে তেমনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আলাপ আলোচনার সূত্রেও হ'তে পারে। এক কথায়, গ্রন্থাগারের কাছে যেমন সকলকে নিয়ে আসতে হবে, তেমনি গ্রন্থাগারকেও সকলের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বড় বড় গ্রন্থাগারে এজন্য একটি ক'রে ভ্রাম্যমান শাখা থাকে,—গ্রামে গ্রামে বই-ভরা গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে

বই দেওয়া-নেওয়া যার কাজ। এর ফলে ব্যক্তিগত সংযোগ আরো বর্ধিত হয়। সকলের আগ্রহ যেমন বাড়ে তেমনি উপকারও হয়। কেননা অনেকেই নানান কারণে হয়ত গ্রন্থাগারে এসে বই প'ড়তে পারে না। তারা বঞ্চিত থাকলে সমাজের একটা বড় অংশই বঞ্চিত থেকে যায়।

বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য মাঝে মাঝে কিছু অনুষ্ঠানাদির পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যেমন, ছোটদের জন্য চিত্রসহযোগে গল্প বা বক্তৃতা। কিম্বা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, ব্যবসায়িক সম্প্রদায়, শ্রমিক বা কৃষক গোষ্ঠী, বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি গোষ্ঠী, আরক্ষণ, প্রসূতি পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। সুনাগরিকতার বিভিন্ন কার্যকরী প্রকল্পও গ্রন্থাগারের আওতায় সম্ভব। বয়স্কশিক্ষার প্রকল্প নিয়ে গ্রন্থাগার সমাজের একটি প্রয়োজনীয় অভাব দূর ক'রতে পারে। সদ্যসাক্ষরদের জন্যও অনুরূপ আয়োজন করা যায়। অর্থাৎ, সমাজের যাবতীয় চর্চা-পরিচর্যার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের করণীয় কিছু না কিছু থাকে। সেটিই গ্রন্থাগারের প্রকৃত প্রচারের কাজ। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান নাগরিক গ'ড়ে তোলার ব্যাপারে গ্রন্থাগার-সম্ভারের সহায়তাই তার উপকরণের সার্থকতা। এবং সেই কথা মনে রেখে উপকরণ-গুলির বহুল ব্যবহারের জন্য সকলকে আগ্রহী ক'রে তোলা বা আগ্রহ অনুযায়ী কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য উপযুক্ত পথ অবলম্বন করাই গ্রন্থাগারে প্রচার।

প্রচারের ধারা—এতক্ষণ গ্রন্থাগারের চৌহদ্দির বাইরে গ্রন্থাগারিক কী কী করতে পারেন সে কথা বলা হ'ল। কিন্তু প্রচারের নিবিড়তর পরিকল্পনার কাজ গ্রন্থাগারের ভিতরে। এই কাজের মধ্যে আছে নূতন বইএর বিজ্ঞপ্তি বা ঘোষণা এবং পুস্তক প্রদর্শনী, গ্রন্থাগারের নানান স্থানে সাময়িকী বা নির্ণয়-পুস্তকাদির (reference books) আকর্ষণীয় সজ্জা, রেকর্ড, ফোটো, ছবি প্রভৃতি শিল্প সামগ্রীর সংগ্রহ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা, পাঠচক্র ও আলোচনা সভার আয়োজন। এছাড়াও গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে স্বাচ্ছন্দ্যকর কিছু ব্যবস্থা করা উচিত যেমন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পরিপাটিভাবে গ্রন্থাগারটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা এবং নীরবে নিঃশব্দে কাজ কর্ম ক'রে গেলেও,—এবং গ্রন্থাগারটির মধ্যে নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য বিরাজ করলেও, সমগ্র আবহাওয়াটুকু যাতে সজীব ও সক্রিয় ব'লে মনে হ'তে পারে তেমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থাগুলিকেও প্রচারের সমগোত্রীয় ব'লে বিবেচনা করা যায়, কেননা, যে কোনো আয়োজনই—

যার লক্ষ্য লোককে আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করা, তাই আন্তরিক আহ্বানের সামিল। শুধুমাত্র প্রদর্শনী বা সাজ-সজ্জাই নয়, গ্রন্থাগারের প্রতিটি নোটিস বা নির্দেশনামা, বিন্যাস, পত্রকাধার বা মঞ্চ,—অর্থাৎ গ্রন্থসম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী অথবা গ্রন্থবিশ্লেষণী যাবতীয় সরঞ্জাম ও প্রচেষ্টাই কোনো না কোনো ভাবে গ্রন্থাগারকে প্রচারিত ক'রছে,—গ্রন্থসম্পদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে, আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছে, সহায়তা ক'রছে শিক্ষার প্রসারে। ক্রেতা, যেমন, কোনো দোকানে গিয়ে যদি আন্তরিকতার অভাব দেখে, স্বচ্ছন্দ বোধ না করে, পরিবেশটিকে প্রীতিকর ভাবতে না পারে, তাহ'লে যেমন সে খুশি হয়না—বার বার ঐ দোকানে যাবার তাগিদ বোধ করে না, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকম দাঁড়ায়। বরঞ্চ এক্ষেত্রে আরো বেশি মাত্রায় আত্মীয় সুলভ ব্যবহার পেলে ভাল। কেননা, এক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম সম্পদের প্রতি তার ঝোঁক। সেখানে যদি সে সাড়া না পায় তা হ'লে মন গুটিয়ে যেতে পারে।

প্রদর্শন ও প্রদর্শনী—প্রতিদিনের সজ্জার অন্যতম অঙ্গ নূতন বইএর সুবিন্যস্ত প্রদর্শন। এর প্রথম ধাপেই আছে window display,—এক ধরনের উন্মুক্ত বিন্যাস। সাধারণত নূতন আমদানি বই-এর অলগ্ন মলাটগুলি (jacket) কোনো ফলকে এমনভাবে গুছিয়ে লাগানো হয় যাতে বইএর সংক্ষিপ্ত বিবরণীর যে অংশ মলাটের ভিতরে থাকে সেটি সকলের নজরে পড়ে। ঐ ভূমিকাটুকু থেকে বইটির বিষয়বস্তু এবং লেখক সম্পর্কে পাঠক একটা ধারণা ক'রে নিতে পারে। মলাটগুলো সাজানোর মধ্য দিয়েও একটা রুচি ফুটে ওঠে। সুন্দর ও সুদৃশ্য পদ্ধতিতে সাজানো সুরুচির পরিচায়ক,—যে দেখে সে আকৃষ্ট হয়, তার মন প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে। গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠকের পারস্পরিক প্রীতি বর্ধিত হয়। অনেক গ্রন্থাগারে মলাটের বদলে মূল বইটিই এভাবে সাজিয়ে রাখা হয়,—যাতে গোটা বইটারই চেহারা সকলে দেখতে পায়। তবে এই পদ্ধতির একটা অসুবিধার দিক আছে। পাঠকরা এসে বইটা নাড়াচাড়া ক'রতে পারে, তাতে সজ্জার ত্রুটি বা হেরফের হওয়া সম্ভব। নাড়াচাড়ার ফলে বইটির অঙ্গহানি—এমনকি চুরি হ'য়েও যেতে পারে। তাই যাঁরা এভাবে বই প্রদর্শন করেন তাঁরা কাচের ঢাকনাওয়ালা বাক্সে বইগুলো রেখে চাবি দিয়ে দেন। হরেদরে এটি মলাট দেখানোর সামিলই হয়। তবে বইএর কোনো বিশেষ অংশ সর্বসমক্ষে জাহির ক'রতে হ'লে এই পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।

বই-এর মলাট (jacket) নানান দিক থেকেই বিশিষ্টতার দাবি ক'রতে পারে। বইটি যে ভাবেই বাঁধানো হোক না কেন, মলাটটিকে সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যায়। বইটিকে বেশি নাড়াচাড়া না ক'রে মলাটের লিখন থেকেই জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানা যেতে পারে। মলাট ধূলোবালি থেকে বইকে রক্ষা করে। লেখক পরিচিতি এবং লেখক রচিত অন্যান্য বই-এর তালিকাও মলাটের কল্যাণে জানা যায়। গ্রন্থাগারিকের কাছে মলাট খুবই প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমাদের দেশে—খুব সম্ভবত বাড়তি খরচ বাঁচাবার জন্যই—মলাটের দিকে নজর দেওয়া হয় না। এমনকি বইএর বাঁধাইও সাধারণত পলকা হয়, সহজেই ছিঁড়েখুড়ে যায়। প্রকাশক দামের বোঝার উপরে বাঁধাই খরচার শাকের আঁটি গ্রন্থাগারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। অথচ সুদৃশ্য মলাট বইকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কাজও ক'রতে পারে।

উন্মুক্ত বিন্যাসের প্রদর্শনী গ্রন্থাগারের প্রবেশ মুখে এবং/অথবা বিশেষ বিশেষ স্থানে একাধিক পর্যায়ে করা বাঞ্ছনীয়। সাময়িকী বিভাগ এবং সাধারণ পাঠকক্ষ এ জাতীয় বিন্যাসের পক্ষে প্রকৃষ্ট। সাময়িকী এমনিতেই সুবিন্যস্ত রাখা হয়। তারই পাশে সাময়িক মূল্যের গ্রন্থাদিরও মলাট-প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা বিধেয়। পাঠকক্ষে নূতন নূতন বইএর সুষ্ঠু বিন্যাসের ব্যবস্থা থাকলে সমগ্র আবহাওয়াটি আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠতে পারে।

এই ধরণের প্রদর্শনীতে কখন কোন বই সাজানো হ'য়েছে তার একটা বিবরণী বা তালিকা গ্রন্থাগারে রাখা উচিত। এই বিবরণে প্রদর্শনের তারিখ, বিষয়, বইয়ের নাম, লেখকের নাম, গ্রন্থসংলেখ (call no.) এবং কোনও বিশেষ মন্তব্য থাকলে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে হয়। এর ফলে সমগ্র প্রকল্পটির ধারাবাহিক নথি থাকে ব'লে কখন কোন বই প্রদর্শিত হয়েছিল তা জানবার অথবা জানাবার সুবিধে হয়। অনবধানতা কিম্বা বিস্মৃতিবশত একই বই একাধিকবার প্রদর্শিত হবার ভয় থাকেনা। মলাটগুলিও প্রদর্শনের পরে খুলে নিয়ে নথিজাত ক'রে রাখা ভাল। বইএর সঙ্গে রেখে দিলে মলাট ছিঁড়ে বা ময়লা হয়ে যায়। এবং ভবিষ্যতে যদি আবার কোনো বিশেষ কারণে প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় তখন মুশকিলে পড়বার আশঙ্কা থাকে। কেবলমাত্র বই অথবা মলাটই নয়, কোনো গ্রন্থের, বিশেষ প্রসঙ্গ নির্দেশ সূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পৃষ্ঠাটি খু'লে রেখেও বিন্যাস করা যায়। এমনকি, সমালোচনা ইত্যাদির অংশও সকলের গোচরে আনা যায়। কোনো

একটি বহুবিতর্কিত বিষয় বা বই সম্পর্কে লোককে কৌতূহলী ক'রে তুলবার, অথবা লোকের কৌতূহল মেটাবার জন্য সেই বইটির সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কিত যাবতীয় মন্তব্য ও সমালোচনা প্রতিসমালোচনার অংশগুলি প্রদর্শনীতে সাজিয়ে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যায়। পুস্তক ব্যতীত প্রাচীরচিত্রও (poster) এভাবে প্রদর্শিত হ'তে পারে।

অবশ্য ব্যাপকতর প্রদর্শনী (exhibition) গ্রন্থপ্রচারের অঙ্গ হিসেবে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। প্রদর্শনী নানা ধরনের হ'তে পারে। কোনো ঘটনার সূত্র ধ'রে বা কোনো বিষয় কিম্বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রেই সাধারণত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। স্থানিক অথবা ব্যপকতর ক্ষেত্রের যে কোনো বিষয় নিয়েই গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী সজ্জিত করা সম্ভব। প্রত্যেক ঘটনা বা প্রতিটি বিষয়েরই একটা গ্রন্থাগারিক দৃষ্টিকোণ থাকে। এবং সেই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী প্রদর্শনী গ'ড়ে তুলতে হয়। কেবলমাত্র বই অথবা পত্র পত্রিকাই নয়, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, পত্রাংশ, পত্রিকাদির বিশেষ অংশ, চিত্র, ফোটো প্রভৃতি সব কিছু সামগ্রীর সমবায়েই প্রদর্শনী। বিষয় তার ভিত্তি। যেমন, নেতাজীর জন্মদিবস, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী, স্বাধীনতা দিবস, সাহিত্য বা সংগীত সম্মেলন,—এই জাতীয় বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তার অনুকূল যাবতীয় তথ্যাদি সাজিয়ে রাখলে সকলের চোখে একটা বিশিষ্ট রূপ ফু'টে ওঠে।

প্রদর্শনীর ধরণ আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানিক হ'তে পারে। যে ধরনেরই হোক, তার সজ্জার মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব থাকা দরকার। প্রদর্শনী রুচি ও শিল্প বোধ যেন প্রকাশ করে এবং দর্শককে যেন অভিভূত ক'রতে পারে। বিন্যাসের বিষয় এবং পদ্ধতি যেন সরল ও প্রাঞ্জল হয়,—দেখে ক্লান্তি না আসে, বিরক্তি বোধের বদলে কৌতূহল বজায় থাকে, গোলোকধাঁধার মতো বিভ্রান্তিকর না হয় সেদিকে সজাগ থাকা দরকার। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে প্রদর্শনী কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না, ধারা অনুসরণের সূত্র প্রকাশ করে মাত্র। সেই সূত্রগুলি যথাযথ বজায় রেখে এর চেহারাটা সর্বতোভাবে নির্দেশক ক'রে তুলতে হয়।

কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষই প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রবেন এমন কোনো কথা নেই। প্রদর্শনী-কক্ষ জনসাধারণের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকেও ব্যবহার ক'রতে দেওয়া উচিত। তার ফলে সকলের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগসূত্র

বাড়ে, সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। এমনকি এই সব সংস্থাকে কোনো লোকহিতকর অথবা লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানের আয়োজনে সাহায্য করাও উচিত। যেমন, চিত্রপ্রদর্শনী বা সংগীতসম্মেলন অথবা কোনো বিষয়ের বক্তৃতা-কেন্দ্রিক আলোচনা সভা। গ্রন্থাগারের সংগ্রহে কেবলমাত্র বই থাকবে তারও কোনো কথা নেই। থাকবে দৃশ্য শ্রাব্য নানাবিধ উপকরণ, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র ও সংগীতের সংগ্রহ। আজকাল রেকর্ডের সহায়তায় ভাষা শিক্ষা অথবা বিশেষ পাঠক্রম শিক্ষার সূচনা হ'য়েছে। এই সকল উপকরণের সহায়তায় বয়স্কশিক্ষা ও সদ্য-সাক্ষরদের শিক্ষাপ্রসারের কাজ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারেন। আর যারা নিরক্ষর তাদের সমাবেশে বই থেকে প'ড়ে শোনানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুনতে শুনতে তা'রা যেমন গ্রন্থের স্বাদ পাবে, জ্ঞান লাভ করবে, তেমনি সাক্ষর হবার আকাঙ্ক্ষাও বোধ করবে। এইভাবে তাদের নানান গল্প শোনানো, গান শোনানো, ছবি দেখানো, তাদের জন্য উৎসব বা মেলার পত্তন,—সবই গ্রন্থাগারের চেষ্টায় হওয়া সম্ভব। বস্তুতপক্ষে, একাজ গ্রন্থাগারেরই। গ্রন্থগৃহ জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা আদান-প্রদানের কেন্দ্র। তাই এটি সকলের প্রয়োজনে উন্মুক্ত রাখা উচিত। সারাদিনের বৃত্তিগত কর্মান্তে এবং দরকারে অদরকারে এখানে এসে যাতে সকলে খোলা মন খোলা মেজাজের খোরাক পায় সেদিকে নজর রাখাই গ্রন্থাগার প্রচারের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা।

বিশেষ গ্রন্থাগারে প্রচার—এতক্ষণ যা বলা হ'ল তা প্রধানত জনসাধারণের গ্রন্থাগারকেই বিশেষ ভাবে মনে রেখে। কেননা, সাধারণ গ্রন্থাগারই সমাজ-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। প্রচারের কাজ মূলত অনবহিতদের জন্য। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে এধরণের প্রচারের প্রয়োজন বড় একটা হয় না। সেখানে পাঠকরা স্বভাবতই গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার সচেতন। তাদের গ্রন্থপাঠের সুস্পষ্ট একটা ধারা বা উদ্দেশ্যও থাকে। জাতীয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে যদি কোনো দেশ বা জাতির শিক্ষা বা বিদ্যাবত্তার মাপকাঠি বলা যায়, তাহ'লে সাধারণ গ্রন্থাগারকে ব'লতে হয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ও সংস্কৃতি জাতির পরিচয়, জাতির সম্পদ ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে তাই নির্বিশেষভাবে সর্বজনীন হ'তে হয়। একাধারে সর্বজনের সম্পত্তি এবং সর্বজনের সেবায় উৎসর্গীকৃত।

কিন্তু প্রচার ও প্রসারের কাজ এত ব্যাপক না হ'লেও কিছু পরিমাণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারেও বর্তমান। কেবলমাত্র ছাত্রদের শিক্ষাক্রমকেন্দ্রিক পড়াশোনা অথবা গবেষকদের বিশেষ পাঠের বই সরবরাহেই কাজ শেষ হয় না, অতিরিক্ত কিছু প'ড়বার ও জানবার প্রসঙ্গও যেমন থাকে তেমনি আছে বিষয়বস্তু বা তথ্যাদির নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত প্রয়োগ। এজন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন ক'রতে হয়,—স্থচী থেকে স্থরু ক'রে নির্দেশিকা বা বিষয়বস্তুর সার সংকলন প্রভৃতি যার অন্তর্ভুক্ত। এই অতিরিক্ত কাজকে যেমন আমরা গ্রন্থাগার প্রসার ব'লতে পারি, তেমনি প্রতিষ্ঠানের আওতায় ছাত্র-শিক্ষকদের কেন্দ্র ক'রে যেসব বাসিন্দা থাকেন, বা অন্য শ্রেণীর কর্মী থাকেন, তাঁদের প্রতি নজর রাখাও উপেক্ষণীয় নয় ব'লে তাঁদের জন্য গ্রন্থাগারটিকে কোনো না কোনো ভাবে উন্মুক্ত রাখাও বিশেষ রকম এক প্রসারের কাজ। সকলের সঙ্গেই সংযোগ রাখতে হয়, ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে যোগাযোগ রেখে চ'লতে হয় গ্রন্থাগারিককে। এবং গ্রন্থাগারের আনুষঙ্গিক খবরাখবর প্রচার ক'রতে হয়। বাৎসরিক বিবৃতি বা গ্রন্থাগার-নির্দেশিকা জাতীয় পুস্তিকা যেমন প্রকাশ ক'রতে হয় তেমনি নৃতন নৃতন বই কী এল তারও তালিকা প্রচার ক'রতে হয়।

শিক্ষা-সম্প্রসারণ বক্তৃতা (extension lecture) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আওতায় প্রচারিত হ'তে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারের মতো এই সব বিশেষ গ্রন্থাগারেও পাঠচক্র (reading circle) বা আলোচনা সভা (symposium) আহূত হয়—যার পরিচালনা বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষদের দ্বারা হ'লেও গ্রন্থাগারিকের অবদানও সেক্ষেত্রে কার্যকর হ'তে পারে। গ্রন্থাগারের কক্ষটিকে নানাবিধ বক্তৃতার কেন্দ্র ক'রে তুলতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষালয়গুলি তাদের বিভিন্ন পাঠক্রমের সহায়ক হিসেবে আশেপাশের অঞ্চলে রকমারি শিক্ষাভিত্তিক প্রসারের কাজ ক'রতে পারে। বিশ্বভারতী পরিচালিত লোকশিক্ষা সংসদ এ ধরণের একটি ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার কেন্দ্র। বিশ্বভারতীর 'চলন্তিকা' প্রকল্পটি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের কাজ করে। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে পুস্তকের আদান-প্রদান তার কাজ। গ্রন্থাগার প্রচারের ক্ষেত্রে এইভাবে বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রতে পারে।

বক্তব্যের উপসংহারে বলা যায়, গ্রন্থাগারগুলি বিস্তৃতভাবে স্বকীয় এলাকায়

এবং সাধারণভাবে গ্রন্থভবনকে কেন্দ্র ক'রে যেমন কতকগুলি চাক্ষুষ উপায়ে প্রচারের কাজ করে তেমনি সূক্ষ্মভাবেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের কাজ ক'রে চলে। কেবলমাত্র বই-এর সংগ্রাহক হিসেবেই গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য শেষ হয় না। অথবা পাঠকদের চাহিদা মতো বই সরবরাহ ক'রেই তাঁর কাজ চুকে যায় না। বইএর যথোপযুক্ত ব্যবহার যাতে হয়, এবং কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যাতে পাঠক পেতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হয়। এই নজর রাখার অন্যতম অঙ্গ গ্রন্থসম্পদের কথা সকলকে জানানো। তথ্য-সরবরাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে প্রচার, প্রসার এবং বিজ্ঞাপনের যাবতীয় উপকরণ ও প্রকল্প নিয়েই গ্রন্থাগারিকের জনসংযোগের জগৎ। গ্রন্থাগারের প্রচার প্রসার শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই প্রচার প্রসার। গ্রন্থাগারের চেহারা এবং উপকরণ-সম্ভার দেখে দেশের হালচাল কৃষ্টি উৎকর্ষ সম্পর্কে যে ধারনা গ'ড়ে ওঠে তা আর কোনো কিছুতেই সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারই প্রকৃত দেশদর্পণ।

গ্রন্থাগারের গ্রন্থাতিরিক্ত কার্যক্রম

গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ যে বিভিন্ন গ্রন্থ দিয়ে পাঠকদের সাহায্য করা একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আজকালকার দিনে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে 'গ্রন্থ' সংজ্ঞাটিকে ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ ক'রতেই হয়। গ্রন্থের প্রধান কাজ একজনের চিন্তাভাবনা অথবা / এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাদি দশজনের গোচরে নিয়ে আসা। বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জ্ঞানধারা সঞ্চিত থাকে গ্রন্থে। ইতিহাস বা অর্থনীতির পদ্ধতি এক ধরনের, সাহিত্য বা দর্শনের প্রকাশধারা অন্য ধরনের। আসল কথা, কোনো মাধ্যমে এই বক্তব্য বা তত্ত্ব-তথ্যাদি চিরকালের জন্য সঞ্চিত ক'রে রাখা। এককালে শ্রুতি ও স্মৃতি সম্বল ক'রে একজনের চিন্তা ও জ্ঞান ভাণ্ডার অপর জনে ধ'রে রাখত, আবার তা ঐভাবে চলত পরম্পরাক্রমে। তারপরে এসেছে পুঁথিলেখার যুগ। ছাপার হরফে এবং লিখিতভাবে একাজ হওয়াটাই চিরাচরিত প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মাধ্যমও বিচিত্রতর হ'য়ে উঠেছে। যেন সেই শ্রুতি-স্মৃতিরই নবরূপায়ন। গ্রামফোনের উদ্ভবের সূত্রে তথ্যাদি রেকর্ড ক'রে রাখা সম্ভব হ'য়েছে। তারপরে এসেছে টেপরেকর্ড ক'রে রাখার যুগ। এসেছে আলোক চিত্রের সহায়তায় ফোটোস্টাট মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদির সম্ভার। তাই আজ গ্রন্থের সংজ্ঞা ব্যাপকতর অর্থলাভ ক'রেছে এবং গ্রন্থাগারের স্বীকৃত সংজ্ঞায় 'সংগ্রহ' ব'লতে গ্রন্থ ছাড়াও ঐ জাতীয় স্থায়ী লিপি, বিবরণী ইত্যাদি বোঝায়। সুতরাং গ্রন্থাগারের সংজ্ঞায় ও কাজে এই ব্যাপকতা স্বভাবতই সংক্রামিত হ'য়েছে। শুধু তাই নয়, এ জাতীয় স্থায়ী সামগ্রীর মধ্যে আলোক চিত্র (photograph), শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র ও বিভূষণ শিল্পাদি (paintings and decorative art), গীতশিল্পী বা যন্ত্রশিল্পীর ধ্বনি-লিপি (musical records) ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। এবং ঐ সঙ্গে স্বভাবতই গ্রামোফোন যন্ত্রাদি এবং শিল্পবস্তু সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থাও গ্রন্থাগারে থাকা প্রয়োজন। ফোটোস্টাট পড়বার যন্ত্র এবং মাইক্রোফিল্মের প্রেক্ষাপট এবং চলচ্চিত্রাদি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সরঞ্জামও রাখতে হয়। আজকের দিনে শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে বেতারযন্ত্রের স্থানও অপরিহার্য।

তাহলে গ্রন্থাগারে গ্রন্থ, অর্থাৎ, সীমিত অর্থে, মুদ্রিত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ছাড়া আর যে সব সংগ্রহ প্রয়োজনীয় সেগুলি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ—

হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি

হস্তলিখিত আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকা

মানচিত্র—পুস্তকাকারে বাঁধানো (atlas) এবং দেয়ালে টাঙানোর জন্য (map) এবং টেবিলে রাখার globe জাতীয়

তথ্য, বিবরণী, ইত্যাদি (charts)

স্থিরচিত্র (slides) এবং প্রক্ষেপণযন্ত্র (projector)

আলোক চিত্র (photographs)

চলচ্চিত্র, সবাক ও নির্বাক (films, movie) এবং প্রক্ষেপণযন্ত্রাদি (projector and screen)

গ্রামোফোন এবং বিবিধ রেকর্ড

টেপ-রেকর্ডার এবং বিবিধ টেপ

ফোটোস্টাট এবং মাইক্রোফিল্ম—প্রক্ষেপণযন্ত্র সমেত

বেতারযন্ত্র, টেলিভিশন

শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র, ডাকটিকিট, মুদ্রা ইত্যাদির সংগ্রহ।

এখন গ্রন্থাগার ভেদে এই সংগ্রহ সম্পর্কিত খুঁটিনাটির প্রসঙ্গে আসা যাক। শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সে শিক্ষার ব্যাপ্তি শিশুশিক্ষা, জনশিক্ষা থেকে স্বরু ক'রে বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা এবং বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র পর্যন্ত। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে সংযুক্ত গ্রন্থাগারের রূপ এবং কার্যক্রম স্বভাবতই ভিন্ন ধরণের। শিশুদের জন্য তাদের বিশেষ ধরণের প্রয়োজনের কথা ভেবে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারের অথবা কোনো শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত বন্দোবস্তের চেষ্টা আমাদের দেশে বড় একটা দেখা যায় না। তবে এখন ক্রমে এদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠান বা জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গেও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে। ইতস্তত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং স্টেট সেনট্রাল লাইব্রেরি, আমেদাবাদ সরকারী গ্রন্থাগার এম, জে, পুস্তকালয়, শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এসব গ্রন্থাগারে শিশুপাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র সঞ্চয় ও চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা এবং নানাবিধ খেলনার সমাবেশও থাকে।

এমনকি, সম্প্রতি বোম্বাই শহরে জহরলাল নেহরুর নামে শিশুদের জন্য কেবলমাত্র পুতুল ও শিশুক্রীড়ার সামগ্রী নিয়ে একটি লাইব্রেরী চালু করা হ'য়েছে—যেখান থেকে শিশুরা বই-এরই মতন খেলনাও কিছুদিনের মেয়াদে নিয়ে যেতে পারে। পুরোপুরি গ্রন্থাগারের কায়দায় না হ'লেও আমেদাবাদের 'বালমণ্ডল' অঙ্গনের নাম এই সূত্রে করা চলে।

শিশুদের জন্য যে গ্রন্থাগার হবে তাতে তাদের অবাধ প্রবেশ এবং নিজেরাই যাতে তাক থেকে বই বাছাই ক'রে নিতে পারে সেভাবে গ্রন্থগৃহ সাজাতে হয়। মঞ্চগুলি উচ্চতায় ছোট এবং টেবিল চেয়ারও নিচু হওয়া দরকার। উপরন্তু ঘরের মেঝেতেও ইচ্ছামত বসা বা খেলার জন্য ফাঁকা জায়গা রাখতে হয়। ফুল এবং ছবি দিয়ে চারপাশটা সাজিয়ে রাখা উচিত। শিশুপাঠ্য এবং শিশুশিক্ষার নানারকম ছবির বই তো থাকেই, এছাড়াও তাদের কৌতূহল নিবৃত্তি এবং সহজ শিক্ষার জন্য যেসব সংগ্রহ রাখা দরকার তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাচীন শিল্প, ও ভাস্কর্য নিদর্শন দেশবিদেশের মানচিত্র ও তথ্যাদির প্রাচীর চিত্র, স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের প্রাচীর পত্র, নানান দেশের ডাকটিকিট ও মুদ্রার সংগ্রহ। এবং ঐ সঙ্গে 'মেকানো' জাতীয় খেলনায় জাহাজ, বিমান প্রভৃতি বিচিত্র জিনিস নির্মাণের শিক্ষা, আলোকচিত্রের সাহায্যে যাবতীয় শিক্ষামূলক ছবি দেখানো, গ্রামোফোন রেকর্ডের সংগ্রহ রেখে গানবাজনা শোনানো, রেডিয়োর মাধ্যমে শিশুদের উপযোগী অনুষ্ঠান পরিবেষণ। গ্রন্থাগার যাতে তাদের কাছে বই পড়ার একঘেয়ে কেন্দ্র না হ'য়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়—একথা গ্রন্থাগারিক মাত্রেই জানেন। "মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিসনে কি ভাই, / তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।"—রবীন্দ্রনাথের এই গানের কলি শিশুদের পক্ষে প্রযোজ্য। তাদের মনে সহজে যাতে নাড়া লাগে, সাড়া জাগে, সেইভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিশুদের বেলায় গ্রন্থ ছাড়াও গ্রন্থাতিরিক্ত বিবিধ বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হয় গ্রন্থাগারিককে। এবং বই ছাড়াও উপরোক্ত বিভিন্ন এবং বিচিত্র সামগ্রীর তত্ত্বাবধান এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে হয়।

গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, সংস্কৃতির ধারা রক্ষা, মনুষ্যত্বের বিকাশ, সুস্থ সমাজ গ'ড়ে তোলা। পুস্তক এর একটা অংশ মাত্র,—বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে। শিশুরা গ্রন্থাগারে এসে বই প'ড়বে, ছবি

দেখবে, গান শুনবে, খেলবে, ছবি আঁকবে,—এক কথায় আনন্দের কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারকে আপন ব'লে মনে ক'রবে, তবেই না তারা সব দিকে বিকশিত হ'য়ে উঠবার প্রেরণা পাবে। গ্রন্থাগারিক তাদের এইসব খেয়াল খুশির মধ্য দিয়েই তাদের নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী চালিত ক'রবেন, রুচিবান ক'রবেন, উন্নত মান গ'ড়বেন, জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন শাখার দিকে তাদের মন আকর্ষণ ক'রবেন। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এসব দিকে নজর রেখে গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা বড় একটা দেখা যায় না, কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তক এবং কিছু গল্পসল্পের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই রেখেই কর্তব্য সেরে দেওয়া হয়। এর দোষ সর্বৈবভাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হয়ত নয়, কেননা গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত অর্থবল তাদের নেই। শিক্ষকদের সামান্য বেতনই প্রায় জুটে ওঠে না তো অতিরিক্ত আর কী তাঁরা ক'রতে পারেন। বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ ক'রতে পারেন না, যদি বা পারেন তো তিনি যাতে সুষ্ঠুভাবে সব দিক বজায় রেখে গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলতে পারেন সে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তবুও দেখা যায়, যতটুকু সম্ভব ততটুকুও করা হ'য়ে ওঠে না। অনেক জিনিসই খুব ছোট ভাবে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আরম্ভ করা যায়। শিশুদের গ্রন্থাতিরিক্ত খেয়াল বা শখের কথা ভেবে আজকাল সরকার অনেক প্রতিষ্ঠানেই খেলনা-বিভাগ (hobby house) চালু করবার প্রেরণা দিচ্ছে। শিশু গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের মধ্যে উপরোক্ত বিবিধ শিক্ষোপকরণের তত্ত্বাবধানও বর্তায়। এর কিছু ভাগ ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় সঞ্চালিত হ'লেও গ্রন্থাগারের আওতার মধ্যে সবটাকে নিয়ে এলে পরিচালনা এবং কার্যকরতার দিকটা সুষ্ঠ ও সুসংহত হ'তে পারে। বিদ্যালয়ের যেসব ছাত্ররা শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে এসে পড়ে তাদের জন্য স্বভাবতই একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার হয়। তবে মালমশলা এবং পদ্ধতি একই রকমের।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ একটু অন্য ধরনের। এখানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য নানান দেশের নানান বিষয়ের বই চাই। সেগুলো সব সময়ে বাজারে মেলে না। সুতরাং কিছু সামগ্রী ফোটোস্টাট ক'রে রাখতে হয়, এমনকি মাইক্রোফিল্ম ক'রে রাখারও প্রয়োজন হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে যেসব প্রতিষ্ঠানে সংবাদপত্র পুরোপুরি বা আংশিক সংরক্ষণের দরকার হয় তাদের পক্ষে মাইক্রোফিল্ম অপরিহার্য। কেননা সংবাদপত্রের কাগজের স্থায়িত্ব-

গুণ কম, এবং আকারগত অসুবিধাজনিত রাখতে যেমন প্রচুর জায়গা লাগে তেমনি ব্যবহার করাও মুশকিল। মাইক্রোফিল্ম ক'রে রাখলে এসব অসুবিধা কমে। বিষয় বিশেষের জন্য অবশ্য সংবাদপত্রের আনুষঙ্গিক অংশ কেটে আলাদা ক'রে নথিভুক্ত ক'রে রাখা চলে। ফোটোস্টাটের জন্য পাঠ-যন্ত্র এবং মাইক্রোফিল্মের জন্য প্রক্ষেপণ-যন্ত্র ও পর্দা রাখতে হয় গ্রন্থাগারে। গবেষণার জন্য যেসব গ্রন্থাগারে পুঁথির সংগ্রহ থাকে সেখানে পুঁথি সংরক্ষণের বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রাখতে হয়। গ্রন্থাগারে বই ব্যবহারজনিত স্বভাবতই জীর্ণ হয়ে যায়, তার মধ্যে এমন অনেক বই থাকে যেগুলো দুষ্প্রাপ্য, তাই সে সব বই বাঁধাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি দপ্তরী বিভাগ সংযুক্ত থাকা অপরিহার্য। সুতরাং বাঁধাই-এর যাবতীয় সরঞ্জাম-সামগ্রীর দায়িত্ব থাকে গ্রন্থাগারিকের উপরে, এবং তাঁকে বাঁধাই-এর খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'তে হয়। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য নানাবিধ রেকর্ড এবং টেপ প্রভৃতি সংরক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি শিখে নিতে হয় গ্রন্থাগারাধ্যক্ষকে। তাছাড়া সমাজবিদ্যা বা ভূবিদ্যা বা অন্যান্য বিভাগের প্রয়োজনে কিছু স্লাইড এবং/বা ফিল্ম থাকে, তার জন্য প্রক্ষেপক (projector) ইত্যাদি সরঞ্জামও লাগে, বিজ্ঞান বিভাগে এজাতীয় সব জিনিসই আজকাল একরকম অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে। সুতরাং গ্রন্থাগারিকেরও দায়িত্ব এবং কর্ম-পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে যেসব প্রবন্ধ বেরোয়,—নিত্য নিত্য জ্ঞানশাখার উন্নতির ফলে যেগুলো পুস্তকে প্রকাশিত বিষয় থেকে স্বভাবতই প্রাগ্রসর,—সে সব প্রবন্ধের বস্তুসংক্ষেপ (abstract) তৈরি ক'রতে হয়, প্রবন্ধ পঞ্জীসহ। একাজও গ্রন্থাগার বিভাগের কর্মীদের। বিশেষ-গ্রন্থাগারগুলির বেলায় এই জাতীয় কাজ সাধারণভাবে গ্রন্থসংরক্ষার কাজ থেকে কম নয় তুল্যমূল্য। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতির স্বতন্ত্র পাঠক্রম থাকে তাদের গানের রেকর্ড সংগ্রহ ক'রে তার জন্য আলাদা কামরার বন্দোবস্ত করতে হয় এবং শিল্প সামগ্রীর জন্য প্রদর্শ-শালা রাখতে হয়। এইসব সংগ্রহের তদ্বির-তদারক এবং সংরক্ষণের ভার স্বভাবতই গ্রন্থাগারিকের উপরে বর্তায়। এইভাবে পুরাতত্ত্ব বিভাগের জন্য ছোটখাট জাদুঘর, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগের জন্য নমুনা সংগ্রহ ইত্যাদির ব্যবস্থাও প্রয়োজন। তবে এসব কাজ বিভাগীয় অধ্যাপকদের দায়িত্বেই সাধারণতঃ সম্পন্ন হ'য়ে থাকে।

গ্রন্থাগারাধ্যক্ষের ভূমিকা সহায়কের এবং প্রয়োজন পক্ষে আংশিক ভারগ্রহণের।

গ্রন্থাতিরিক্ত কাজ সবচেয়ে জটিল ও ব্যাপক হ'য়ে থাকে সাধারণ গ্রন্থাগারের বেলায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের আওতার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পড়ে, —শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে। আমরা সাধারণত গ্রন্থাগারের কার্যক্রমকে সংকুচিত অর্থে ধরি ব'লে এর সীমাহীন সম্ভাবনার দিকটা উপেক্ষিত থেকে যায়। শিক্ষা, রুচি, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ব্যাপক বিস্তার এবং ব্যক্তিক উচ্চ মান গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। কেবলমাত্র অবসর-বিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারের ব্যবহার শুধু নিরর্থক নয়,—গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কেও অসম্মানজনক। সুতরাং জ্ঞান ও শিক্ষা, তত্ত্ব ও তথ্য কিভাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেই বিষয়ই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা দরকার। সেজন্য বই বা পত্র-পত্রিকা ছাড়াও আনুষঙ্গিক নানান মাধ্যমের ব্যবহার অপরিহার্য হয়। এর মধ্যে কিছু পরিমাণ গ্রন্থ বা সাময়িক-পত্র ভিত্তিক। যেমন, গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবার জন্য মলাট অথবা বস্তুসংক্ষেপ চোখের সামনে রাখা, কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে সেই বিষয়ের মুদ্রিত পুস্তকাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বিবরণী ইত্যাদি প্রকাশ্য ভাবে সাজিয়ে রাখা। গৌণ উপায় হিসেবে কিছু চিত্র প্রদর্শন বা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা। তৃতীয়তঃ, রেডিয়ো, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম রেখে মাঝে মাঝেই সেগুলোকে কেন্দ্র ক'রে বিবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা। সাধারণ লোক, যারা প'ড়তে পারে না, তাদের জন্য রেডিয়ো প্রভৃতির মাধ্যম এবং সচিত্র বক্তৃতাদির মাধ্যম বিশেষ কার্যকর। আর, চতুর্থতঃ, এই সঙ্গেই থাকবে স্থির চিত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি দেখাবার বন্দোবস্ত। এই সমস্ত সামগ্রী শুধু যে গ্রন্থাগারেই সঞ্চিত থাকবে এবং গ্রন্থাগার গৃহেই প্রদর্শিত হবে তার কোনো কথা নেই, বরঞ্চ তা না থাকাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। গ্রন্থাগারের একটি বা দুটি গাড়ি থাকা দরকার, যাতে দূরাঞ্চলে বই নিয়ে গিয়ে বিলি করা যায় এবং চলচ্চিত্রাদির সরঞ্জাম ব'য়ে নিয়ে প্রয়োজন পক্ষে ব্যবহার করা যায়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই ধরনের ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার (book mobile)-এর প্রচলন আছে, যার থেকে শিশু যুবক বৃদ্ধ সকলেরই খোরাক জোটে। কিছু চলমান গ্রন্থগৃহ (trailer library) থাকে, —যার বন্দোবস্ত প্রায় ঘর-বাড়িরই মতো। এইসব চলমান গৃহে গ্রন্থকক্ষ,

পাঠকক্ষ ইত্যাদি সবই থাকে। কোনো গ্রামে একদিন কোথাও বা একাধিক দিন থেকে আশপাশের অঞ্চলে গ্রন্থসরবরাহের কাজ চলে। পঞ্চমতঃ, সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাতিরিক্ত সামগ্রী হিসেবে থাকবে গ্রামফোন রেকর্ড এবং চিত্র-সংগ্রহ। এগুলিও বই-এর মতো সর্বসাধারণ কিছুদিনের মেয়াদে ধার নিয়ে যেতে পারবে। এর ফলে সংগীতে চিত্রে গৃহ-পরিবেশ ও গৃহসজ্জা মনোরম হ'য়ে উঠবে, রুচির মান উন্নত হবে, মন প্রসন্ন থাকবে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রন্থাতিরিক্ত বিবিধ সামগ্রী সব ধরনের গ্রন্থাগারের বেলাতেই একপ্রকার, কেবল তার ব্যবহার প্রণালী বিভিন্ন। শিশুদের গ্রন্থাগারেও যেমন গ্রামোফোন, বেতার, চলচ্চিত্র প্রভৃতি রাখতে হয়, বিদ্যালয় এবং সাধারণ গ্রন্থাগারেও তাই। কিন্তু কোন গ্রন্থাগারে কোন ধরনের সংগ্রহ থাকবে তা নির্বাচন ক'রে নিতে হয় গ্রন্থাগারিককেই। সুতরাং পুস্তকের মতো এগুলিরও নির্বাচন থেকে সুরু ক'রে বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রকল্প পার হ'য়ে মঞ্চে হাজির করা পর্যন্ত সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নির্বাচনের বেলায় শিশুদের গ্রন্থাগারে তাদের বোধশক্তি এবং গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী সংগ্রহ দিয়ে সাজাতে হয়, ডাকটিকিট বা মুদ্রার মতো কৌতূহলোদ্দীপক সংগ্রহ-মাধ্যমে খেলার ছলে শিক্ষা দেবার কথা ভাবতে হয়। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশেষ-বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থাগারে স্বভাবতই শিক্ষা বা গবেষণার মান অনুযায়ী এই জাতীয় সামগ্রী বাছাই ক'রতে হয়। আর, সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এর প্রত্যেকটি পর্যায়কেই স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে বিচার করা দরকার। কেননা, এখানে সব বয়সের, সকল শ্রেণীর পড়ুয়াই আসবে। তাই বিভিন্ন পর্যায়ের প্রসঙ্গ অনুযায়ী স্বতন্ত্র বিভাগ তৈরি ক'রে নিলে কাজ সহজ হয়। এক মহলে থাকে শ্রাব্য-দৃশ্য (audio-visual) সরঞ্জাম,—যার জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর দরকার, আরেক মহলে থাকবে গ্রন্থবিদ্যা (bibliography) সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা,—যেখানে বই-এর ভিতরের বাইরের সব বিবরণ পাওয়া যাবে, গ্রন্থতালিকা মিলবে। আরেক দিকে রাখতে হয় সাময়িক পত্রিকা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত প্রবন্ধাদির বস্তুসংক্ষেপ (abstract) তৈরি করার ব্যবস্থা, আরেকদিকে রাখতে হবে পাঠসহায়ক (reference) বিভাগ,—যার কাজ সাধারণের নানাবিধ প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করা এবং ঐ বিষয়সংক্রান্ত তথ্যাদি কোথায় কি ভাবে পাওয়া যায় তার সাহায্য ও নির্দেশ

দেওয়া। আর, বলা বাহুল্য, একটা দল থাকবে দূরাঞ্চলে গ্রন্থ ও তথ্যসহায়ক সামগ্রী ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য। গ্রন্থাগারের পক্ষে, বিশেষ ক'রে সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে, কিছু প্রচারের কথা ভাবতে হয়। গ্রন্থাগারের প্রচার বই অথবা আনুষঙ্গিক সামগ্রীর বিজ্ঞপ্তিমাত্র নয়, এমনকি এসব সম্পদ জাহির করবার জন্যও নয়। গ্রন্থাগারে প্রচারের মূল সূত্র হচ্ছে জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন ধারার দিকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, অর্থাৎ তথ্যাদি লোকগোচরে প্রদর্শনের (display) মধ্য দিয়ে এই কথা বলা যে, এস, দেখ, অমুক অমুক বিষয়ে এই এই তথ্যসম্ভার আমরা রেখেছি, তোমরা এসে সেই সুযোগ গ্রহণ কর, এবং এই সব বিষয়ে তোমাদের মতামত দিয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাদের সংগ্রহ সমৃদ্ধতর কর, আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ কর। যারা নিজের থেকে আসতে উন্মুখ নয় তাদের কাছে সামগ্রীসম্ভার নিয়ে গিয়ে জ্ঞানার্জনের দিকে তাদের ঝোঁক এনে দেওয়াও এই প্রচার প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য। শূন্য মনেও এই পদ্ধতিতে কৌতূহলের সঞ্চার করা যায়। সেই সঞ্চরণশীলতাই গ্রন্থাগারের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা

শুধু রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষেই নয়, রবীন্দ্র-আলোচনার ক্ষেত্রমাত্রেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথকে নানান দিক থেকে নানাবিধ টুকরো অবস্থায় এনে খাড়া ক'রে দেখবার চেষ্টা। শতবার্ষিকীর সুবাদে এটা ব্যাপকতর হয়েছে। এ ধরনের আলোচনাতে যে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিক ধরা পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং তার ফলে আমাদের চিন্তা এবং বহুমুখী আস্বাদনের জগৎও বিস্তৃততর হয়। যদিও কেরানী রবীন্দ্রনাথ, চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চমকপ্রদ গালভরা অথচ অস্বাচ্ছন্দ্যকর শিরোনামার অনুসরণে গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্রনাথকেও দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে বোধ করি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-জগতের এই দিকটাকে অযথা গণ্ডীবদ্ধ করা হয়। তাই শুধু গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ দিয়ে সীমাবদ্ধ না ক'রে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন গ্রন্থচিন্তার আকাশপটটি হৃদয়ে প্রতিফলিত করবার চেষ্টাই সঙ্গত।

গ্রন্থাগার পরিচালনার বিদ্যা আজকের দিনে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব'লে স্বীকৃত কেবলমাত্র গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং গ্রন্থ সংরক্ষণেই গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য শেষ হয়না, জ্ঞানের বিশালতর ক্ষেত্রের জরীপ ক'রে পথের সংকেতও তাঁকেই দিতে হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার একদিকে র'য়েছে গ্রন্থ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি, গ্রন্থবর্গীকরণ এবং সংরক্ষণের বিবিধ বৈজ্ঞানিক আয়োজন, অন্যদিকে র'য়েছে গ্রন্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠকবর্গ ও গবেষক মণ্ডলীর কাছে এনে হাজির করা। সুতরাং গ্রন্থাগার যেমন একদিকে গ্রন্থের ভাণ্ডার, অন্যদিকে তেমনি গ্রন্থালোচিত বিষয়ের স্মারক এবং নির্দেশক। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য একদিকে যেমন গ্রন্থ সমূহের সুষ্ঠু সমাবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্যদিকে তেমনি সুসমঞ্জস উপায়ে আলোচনা এবং গবেষণায় সহায়তা করা।

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম মনে এই সত্যগুলি এত সহজে ধরা দিয়েছিল যে, ভাবতে গেলে কিছুটা আশ্চর্য হ'তে হয় বৈকি। অথচ আজীবন যাঁর কারবার বিদ্যা ও জ্ঞান নিয়ে, তাঁর কাছে এ সত্য ধরা পড়াই তো স্বাভাবিক। অত্যন্ত অল্প কথায় তিনি গ্রন্থাগারের স্বরূপ এবং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের কথা ব'লে গেছেন। এবং,

কী আশ্চর্য, এইটুকুর মধ্যে গ্রন্থ বিদ্যার সব কথাই ব্যক্ত করেছেন তিনি। সুদূর ১২৯২ সালে তিনি লিখছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহানন্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" মানুষের উপলব্ধির একমাত্র ধারক ও প্রসার-কেন্দ্র গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। গ্রন্থের মধ্যে মানুষ 'অতীতকে বর্তমানে বন্দী' ক'রে রাখে, এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত ক'রে দেয়। রবীন্দ্রচিন্তায় গ্রন্থের এই স্থিতিশীল অথচ চলমান রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহের স্বরূপ কেমন হবে তাও শুনুন। "এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে, বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে, সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে।" অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সর্ব বিষয়ের বই তো থাকবেই, একই বিষয়ের বিভিন্ন মতবাদের বইও থাকবে পাশাপাশি। কোনো বিশেষ দল বা বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাত থাকবেনা গ্রন্থাগারিকের, ব্যক্তিগত চিন্তায় থাকলেও গ্রন্থাগার নির্মাণে তাঁকে হ'তে হবে নিরপেক্ষ। সর্বশ্রেণীর এবং সর্ববিধ মত ও পথের পুস্তক সংরক্ষিত হবে গ্রন্থাগারে, যাতে একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক চিন্তা ক'রতে পারেন। গ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাইএর এই মূল নীতি আজকাল গ্রন্থাগারিক মাত্রেই জানেন। একথাও জানেন যে, এই সংগ্রহ নিপুণভাবে ক'রতে হবে যাতে অবান্তর পুস্তক গ্রন্থাগারকে অযথা ভারাক্রান্ত না করে। ১৩৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ব'লছেন দেখুন, "অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা ক'রে রাখে।" অর্থাৎ এমন বই দিয়ে গ্রন্থাগার ভ'রে তুলতে হবে যেগুলি পাঠকবর্গের কাজে লাগবে, অকেজো বই চটকদার অথবা নামকরা হ'লেও যদি ব্যবহারে না লাগে তো শুধু শুধু শোভাবর্ধনের জন্য রাখা অর্থহীন, কেননা সব বই সব গ্রন্থাগারের উপযুক্ত নয়। রঙ্গনাথনও তাঁর গ্রন্থবিজ্ঞানের পঞ্চনীতির প্রথমেই বলেছেন, 'Books are for use,' বই ব্যবহারের জন্য।

সংগ্রহের পূর্বে পাঠক-গোষ্ঠীর মান অনুযায়ী পুস্তকের পঠনযোগ্যতা ও পঠন-সম্ভাবনীয়তা বিবেচনা ক'রে দেখা কর্তব্য। দেশে বিদেশে এমন গ্রন্থাগারের অভাব নেই যেগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থসংখ্যার কৌলিন্যে আভিজাত্য দাবী করে; অথচ এমন গ্রন্থাগারই অভিজাত যার বাছাই-করা পরিমিত সংগ্রহ উচ্চস্তরের।

"লাইব্রেরিকে ব্যবহারযোগ্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত পাই। আজকাল সাধারণ পাঠাগার, বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং কোনও বিশেষ বিষয়ের বা গবেষণা গ্রন্থাগারের পারস্পরিক পার্থক্য ও স্বনির্ভর প্রয়োজনীয়তা সর্ব-স্বীকৃত। কোন গ্রন্থাগার কী ধরণের হবে, কোন কোন বই সেখানে তালিকা-ভুক্ত হবে এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট নীতি থাকা শুধু প্রয়োজন নয়, আবশ্যিক। তা না হ'লে একদিকে যেমন অনর্থক অর্থব্যয় হবে অপরদিকে তেমনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সুষ্ঠু সমাবেশ হবে অসম্ভব। এই 'পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ' ক'রতে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বা খণ্ডিত বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটিও এই সূত্রে ভেবে দেখা যায়, কেননা 'লাইব্রেরির পরিচয়' ব'লতে বুঝি তার সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, নির্বাচিত পুস্তকের বিষয়গত সীমা।

গ্রন্থ-তালিকা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারা লক্ষণীয়। "সাধারণত লাইব্রেরি ব'লে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই। তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে এসে পাঠককে অভ্যর্থনা ক'রে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হ'ল বড় লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে।" গ্রন্থ তালিকা তৈরী ক'রবার আধুনিক যে পদ্ধতি তার মূল কথাটাও এই। কেবলমাত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তার নামের নিষ্প্রাণ তালিকা নয়, গ্রন্থপরিচিতিও আবশ্যক। এই থেকে subject catalogue বা বিষয়ানুগ তালিকার সৃষ্টি। উপরন্তু 'এগিয়ে এসে পাঠককে অভ্যর্থনা' ক'রবার জন্য রয়েছে display বা পুস্তকের ঘোষণা, এবং আনুষঙ্গিক সব পদ্ধতি যাকে গ্রন্থাগারের ভাষায় বলা হয় publicity বা প্রচারের কাজ। এই ধরনের তালিকা প্রণয়ন ও ঘোষণার মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগারের 'প্রকৃতি'টি

জানানো। গ্রন্থাগারের 'আকৃতি' অপেক্ষা 'প্রকৃতি' যে প্রধান তা' আজকের গ্রন্থাধ্যক্ষরা সকলেই জানেন, এবং ছোট বা বড় সব গ্রন্থাগারেরই তাই লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি ক'রে তোলে।" এতে একদিকে যেমন গ্রন্থাগারের তরফে 'আহ্বান' জানানোর কথা আছে অন্যদিকে তেমনি আছে গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগারিকের গুরু দায়িত্বের কথা। রঙ্গনাথন তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্রন্থনীতিতে বলেছেন 'every reader his book' এবং 'every book his reader' অর্থাৎ প্রত্যেক পাঠককে দিতে হবে পছন্দমতো বই এবং প্রতিটি বইএর জন্যই থাকবে এক বা একাধিক পাঠক। পাঠক শুধু চাঁদা দিয়ে নয়, তাঁর চাহিদা দিয়েও গ্রন্থাগারকে 'তৈরি' ক'রে তোলে। গ্রন্থাগার প্রতিটি বইএর জন্য 'আহ্বান' জানিয়ে 'তৈরি' ক'রে তোলে পাঠক সম্প্রদায়। আমরা আধুনিক গ্রন্থসেবীরা জানি কিভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তকের পাশে অনুরূপ বিষয় সংক্রান্ত আরো বই রেখে, এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবার অন্যান্য উপায় অবলম্বন ক'রে পাঠকদের আগ্রহ বাড়াতে হয় এবং একটি পাঠকগোষ্ঠী গ'ড়ে তুলতে হয়। শুধু তাই নয় পাঠকের রুচির পরিবর্তন বা রুচির গঠনও এই উপায়ে সম্ভব। পাঠক-সাধারণের রুচি গঠনের সামাজিক দায়িত্ব আংশিকভাবে গ্রন্থাগারিকের উপর বর্তায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থ-ভাণ্ডারের কাণ্ডারীবৃত্তি ছাড়াও রুচি সংরক্ষণ এবং বিদ্যানুগ বিশ্লেষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন। "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হ'লে চলবে না।" আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞানের এইটিই প্রধান ভিত্তি। সমগ্র গ্রন্থ-জগতেরই শুধু নয়, অধীত বিদ্যার প্রত্যেক শাখা সম্বন্ধেই গ্রন্থাগারিকের জ্ঞান থাকা চাই। এবং এই জ্ঞানের প্রয়োগে পাঠকবর্গকে সাহায্য এবং, এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালনা ক'রবার যোগ্যতাও গ্রন্থাগারিকের থাকা চাই। 'গ্রন্থবোধ' থেকে তিনি গ্রন্থের ভালমন্দ এবং সেই সেই গ্রন্থকে ভিত্তি ক'রে সামাজিক ভালমন্দ যাচাই ক'রে যেন নিতে পারেন। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি মনে করেন "প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই।" এবং আশা করেছেন গ্রন্থাগারিক "এই

মণ্ডলীকে তৈরী ক'রে তুলে একে আকৃষ্ট ক'রে রাখতে" পারবেন ; কেননা "তার উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থ পাঠকের।"

আজকাল আমরা union list of serials তৈরি করবার কথা ভাবি, library co-operation এর কথা ভাবি এবং Farmington plan এর গুণগান করি। কিন্তু বহু বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে প'ড়েছিল। পত্রিকার প্রবন্ধাদির সার সংকলন বা abstraction এর কথাও তিনি ব'লেছেন। গ্রন্থাগারে যেসব দেশীয় বা বৈদেশিক পত্র-পত্রিকা আসে "যদি লাইব্রেরির যাচাই বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্যপ্রবন্ধগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত ভাবে নির্দিষ্ট ক'রে একটা তালিকা" প্রস্তুত করেন তবে "পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিন্ত বাড়ে।" এই জাতীয় নানাবিধ পত্র-পত্রিকা এবং বিশেষ বিশেষ পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে কোনো গ্রন্থাগার যদি "খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠযোগ্য ভাল বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়" তবে একদিকে যেমন প্রকাশকেরা সেখানে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নূতন বইএর খবর দিতে পারেন অন্যদিকে তেমনি তামাম দেশের পাঠক সেখান থেকে বই বা পত্রিকা এনে কাজে লাগাতে পারেন। এর ফলে যেমন সকলের পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ বেড়ে যায় তেমনি অন্যান্য গ্রন্থাগারও অনুরূপ তালিকা প্রণয়ন এবং বৈশিষ্ট্য অর্জনে উৎসাহিত হ'তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তার আরেকটি দিকও আছে। তিনি বলেছেন, "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ তার গৌণ কাজ।" 'সচেষ্টভাবে' গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে হ'লে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ পরিচয়ও গ্রন্থাগারিকের নিজের থাকা প্রয়োজন। আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞান গ্রন্থাগারিকের এই গুণটির উপরে জোর দেয় সবচেয়ে বেশি, এবং এজন্য পুস্তকের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পারিচয়, অর্থাৎ bibliography, এবং সর্বসাধারণকে পঠনের ব্যাপারে সক্রিয় সহায়তা, অর্থাৎ reference-এর কাজে দীক্ষিত হ'তে হয়। 'গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষা' গ্রন্থাগারিকের পক্ষে 'গৌণ কাজ' হ'লেও সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না। "লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।" গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র

ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থের সমাবেশই এই বক্তব্যের মূল লক্ষ্য নয়, স্বল্প ব্যবহৃত অথচ অপরিহার্য গ্রন্থ কথনো ব্যবহারে লাগতে পারে মনে ক'রেও গ্রন্থাগারে সমাবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ 'গ্রন্থবোধ' সম্পন্ন গ্রন্থাধ্যক্ষ সুনিপুণভাবে এই দুই দিক বজায় রেখে পুস্তক নির্বাচনের কাজ ক'রবেন এবং 'সচেষ্টভাবে' তাঁর 'পাঠকমণ্ডলীর' কাছে সেগুলির 'পরিচয় সাধন' করিয়ে দেবেন। গ্রন্থাগারিককে একাধারে গ্রন্থাধ্যক্ষের ও পাঠকের কাজ ক'রতে হবে। "আতিথ্য পালনের" সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নেবেন স্ব-প্রবর্তিত আতিথ্যের স্বাদ। সেইখানেই তাঁর পরিপূর্ণ শিক্ষা ও যোগ্যতা।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলির মধ্যে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের পরিচয়ের ভিত্তি রয়েছে। লাইব্রেরিয়ান কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নন, গ্রন্থের অধ্যক্ষ ; এবং একথা গ্রন্থাগারের সব কর্মীর পক্ষেই খাটে। এই জন্যই প্রবন্ধের শিরোনামা দিয়েছি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা। তাঁর কথায়, গ্রন্থের স্বল্প পরিধির মধ্যে যেমন রয়েছে জ্ঞানের বিশাল বারিধির পরিচয় তেমনি এই স্বল্প ভাষণের মধ্যেও রয়েছে গ্রন্থবিদ্যা এবং গ্রন্থাগার-বিদ্যার ভূমিকা। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেও চিন্তাকার্পণ্য দেখান নি এবং সেইটিই গ্রন্থবিদজগতের গর্ব।*

---

* ১। 'লাইব্রেরি' ; বিচিত্র প্রবন্ধ ; ররীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯।

২। 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' ; অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন, ১৯২৮ খ্রীঃ ; জন্ম শতবার্ষিক সং রঃ রঃ, (পঃ বঙ্গ), ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২১-২৩।

বাংলা বই ও গ্রন্থাগার

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বই-এর সরবরাহ এবং গ্রন্থাগারের প্রসারের প্রয়োজন হ'য়েছে। এই সূত্রে সরকার নানারকম পরিকল্পনা প্রস্তুত ক'রছেন। কোনো কোনো পুস্তক প্রকাশের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য, ভাল বইএর জন্য নানারকম পুরস্কার (বেশির ভাগই অবশ্য বেসরকারী), সাহিত্য আকাদেমি, জাতীয় পুস্তক সংস্থা, ইত্যাদি অনেক কিছুরই সূত্রপাত হ'য়েছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজও ব্যাপক ভাবে শুরু হ'য়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগার-গুলিকেও এবিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। একপক্ষ অপর পক্ষের উপরে ভরসা ক'রে বা দোষারোপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না। আজকালকার দিনে এদের একের সঙ্গে অন্যের এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, এবং একটার উপরে আরেকটা এমনভাবে নির্ভরশীল যে মিলেমিশে চিন্তা না ক'রলে, কিম্বা যৌথভাবে কাজ না ক'রলে স্থিতিশীল কিছু গ'ড়ে উঠবে না। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে, নানান শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে, আর তেমনি বাড়ছে লেখকদের সংখ্যা, প্রকাশকদের সংখ্যা। অন্যান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে ইউরোপ এবং আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে আমাদের তুলনা ক'রবার সময় এখনো আসেনি। সুতরাং তাদের বাজারের সঙ্গে আমাদের তুলনা টেনে এনে কিছু লাভ নেই।

এই ধরনের সমস্যা নিয়ে কিছুকালের মধ্যে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন 'দেশ' পত্রিকার ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত রাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ 'পরিপূর্ণ সাহিত্য'; Indian Librarian পত্রিকার December, 1958 সংখ্যায় P. K. Banerjee লিখিত 'The Problem of book-production in India'; 'সাহিত্যের খবর', আষাঢ় ১৩৬৬, সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 'বাংলা বইয়ের ভবিষ্যৎ' এবং শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন ঘোষ লিখিত 'গ্রন্থাগারিক বনাম প্রকাশক'।

তাহ'লে একটু ভেবে দেখা দরকার আমাদের শিক্ষাদীক্ষার গতি কোন পথে, বই-এর বাজারেরই বা কী হাল। রাজশেখরবাবুর হিসেব থেকে মনে হয় আমাদের জ্ঞানকাণ্ডের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক। কর্মকাণ্ডে অনেকে এদেশে বিদেশের ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রে কাজে লেগেছেন এবং দেশের শিল্পবাণিজ্যের দুঃখ দূর ক'রছেন। কিন্তু সাহিত্য বলতে বাজারে যা বেরুচ্ছে তার প্রায় সবই উপন্যাস জাতীয়। এবং সাহিত্যিক তাঁকেই বলি যিনি ঔপন্যাসিক। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। দুনিয়ারই এই হালচাল। সাহিত্য জগতে প্রবন্ধকারদের স্বীকৃতি আছে, প্রচুর মর্যাদাও আছে, তবু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন তাঁরাই সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন বেশী। আসলে মানুষের জীবনের খুব কাছাকাছি এসে কথা বলেন যিনি তিনিই সাহিত্যিক। প্রবন্ধকারও যে তা বলেন না তা নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে একেবারে ঘরের কথা ঘরোয়াভাবে বলেন না। সাহিত্যিকের সমাদর এবং সাহিত্যের পাঠক সর্বদেশে ঐ একই রকমের। ইউরোপ, আমেরিকার অধিকাংশ পাঠকই উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক গল্প, ডিটেকটিভ কাহিনী পড়েন। তবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রবন্ধের পাঠক ও লেখকের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া উচিত। উপন্যাস পাঠে যে চিন্তার বীজ মনে জন্মায়, প্রবন্ধ পাঠে তা দানা বাঁধে, সুসংহত অঙ্কুরে পরিণত হয়। সেই রচনাই সার্থক যেখানে প্রবন্ধের মধ্যে ঔপন্যাসিক উঁকি মারেন, উপন্যাসের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেন প্রবন্ধকার।

কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা কদাচিৎ এই সামঞ্জস্য রাখতে পারি। প্রবন্ধ আর গল্প, সংবাদ ও সাহিত্য প্রায়ই একাকার ক'রে ফেলি আমরা। বিদেশে জার্ণালিজম আর লিটারেচার—এ দু'য়ের সীমারেখা মাঝে মাঝে কাছাকাছি হ'য়ে এলেও কখনো এক হ'য়ে যায়নি। সাংবাদিকতা সাহিত্যের আসরে এসে কল্‌কে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেনি। সাধারণ চিত্তবিনোদনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে খোশগল্পের সুরটাই বজায় রেখেছে। কিন্তু আমরা এ দুটোকে এক ক'রে ফেলছি। গজিয়ে উঠছে সংবাদ-সাহিত্য। প্রবন্ধ এসে উপন্যাসের টুঁটি চেপে ধরছে, কিম্বা উপন্যাস গিয়ে প্রবন্ধকে শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছে। সাহিত্যজগৎ জুড়ে শুধু রম্যরচনার সুর। রম্যরচনাকে ফরাসী 'বেলে লেত্‌র্' গোত্রভুক্ত করা হ'লেও সেই ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রকে লঙ্ঘন ক'রে সাহিত্যের এবং বিশিষ্ট জ্ঞানের আঙিনায় তার আনাগোনার

চটুল প্রয়াস। সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার উদ্বাহ দ্বারা রম্যরচনার সংসার জমজমাট। আড্ডা, গালগল্প, ভ্রমণকাহিনী থেকে শুরু ক'রে ইতিহাস, বিজ্ঞান পর্যন্ত এর সীমা বিস্তৃত। এত ব্যাপক ক্ষেত্রে এর বিচরণ যে অনেক ভাল রচনাও এই শ্রেণী বিভাগের হিড়িকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাহ'লে সাংবাদিকতা-মার্কা সাহিত্য কি অপাংক্তেয়? রম্যরচনার গুণ অনেক, সুবিধে প্রচুর। এর ভাষা আর ভাবের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র, এর বিষয়-বৈচিত্র্য, এক কথা বলতে গিয়ে সেই সূত্রে অন্য কথা টেনে এনে মধু ঢালবার বা হুল ফোটাবার সুবিধে,—এ-সমস্তই রম্যরচনাকে একটা বিশেষত্ব দান ক'রেছে। উপন্যাস বা গল্পের মতো নিছক সৃষ্টির কষ্ট বা প্রবন্ধের মতো নির্দিষ্ট মালমশলা নিয়ে মাথা ঘামাবার শ্রম কোনোটাই এতে নেই, দায় আছে কিন্তু সেই পরিমাণে দায়িত্ব নেই,—অথচ কর্ণরোচক ক'রে বক্তব্য পরিবেষণ করা যায়। কিন্তু রম্যরচনাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে ভাববার কথা বই কি। কারণ চটুল ভঙ্গীর রস চিন্তাস্রোতকে শৈবালাচ্ছন্ন করে। আজকালকার দিনে পাঠকদের সময় কম, অথচ যদি সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক থাকে তাহ'লে মনকে চোখ ঠারার মতো কিছু করা দরকার। সারা জীবন মুনাফাখোরের কর্ম ক'রে শেষে কোনো কৈবল্যানন্দ গুরুজী পাকড়ে দর্শনী দিয়ে পুণ্য অর্জনের মতো যেন। তবু একথা অনস্বীকার্য যে রম্যরচনা একদিকে যেমন কিছু পরিমাণে সাহিত্যমোদীর তৃষ্ণা মেটাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি কিছু কিছু পাঠকের মধ্যে জ্ঞানার্জনের ঝোঁক তৈরি করছে।

নিজের অভিজ্ঞতার এবং রসবিচারের ভিত্তিতে মনে যেসব চিন্তার উদয় হয় তারই ছিঁটেফোঁটা অন্যকে বিতরণ করবার জন্যে লেখক কলম ধরেন। অর্থাৎ বাস্তবে কল্পনায় মিলিয়ে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকদের একটা যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রকাশক বাজার বুঝে, অর্থাৎ পাঠকদের চাহিদা বা প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে সেটিকে প্রকাশ করেন। সুতরাং পাঠকই আসল। পাঠকের অপ্রকাশিত দাবী উপলব্ধি ক'রে প্রকাশক হাজির হন লেখকের দরবারে। লেখকও হয়ত প্রকাশকের দরবারে হাজির হ'তে পারেন, তবু পাঠকের দাবীটাই প্রধান। কিন্তু তা হ'লেও সবটাই পাঠকের ওপর নির্ভর করে না। বরঞ্চ প্রকাশকেরা কিছু পরিমাণে পাঠক তৈরী করেন। অর্থাৎ পাঠকদের দরবারে নানাবিধ মালমশলা হাজির ক'রে দিয়ে একটা চাহিদা বা বাজার সৃষ্টি করেন। সুতরাং পাঠকের রুচি তৈরি ক'রবার ব্যাপারে প্রকাশকদের কিছুটা কৃতিত্ব আছে ব'লে মনে হয়। লেখক

তাঁর ইচ্ছেমতো লিখতে পারেন এবং প্রকাশকও তাঁর খুশিমতো বই ছাপতে পারেন, কিন্তু পাঠক সে বই প'ড়বেন কি প'ড়বেন না সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব রুচি বা মেজাজের ব্যাপার। পাঠকও ইচ্ছে ক'রলে যেমন খুশি বই-এর জন্যে বায়না ধরতে পারেন, কিন্তু তেমন বই লেখা হবে কিনা বা প্রকাশিত হবে কিনা সেটা তাঁর ইচ্ছের উপরে নির্ভর করেনা। আসলে এই তিনজনের মিলিত ইচ্ছায় আপনা থেকেই, এমন কি পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই একটা মান তৈরি হ'য়ে যায়, এবং সেই মান অনুযায়ী সাহিত্য রচিত হয়। লেখক এবং পাঠক উভয়কে প্রকাশক নিয়ন্ত্রিত ক'রলেও পাঠক তৈরী করা তাঁর কাজ নয়।

যেমন গ্রন্থাগারিকেরও কাজ নয় পাঠক তৈরি করা। অথচ পাঠকদের হাতে তাঁদের খুশিমত যে কোন বই তুলে দেবার আগেও গ্রন্থাগারিককে বিবেচনা ক'রে দেখতে হয়। পাঠকদের দাবী বা ইচ্ছাপূরণ করাই গ্রন্থাগারিকের একমাত্র কাজ বা প্রধান কর্তব্য হ'লেও সমাজ-মন বা সমাজ-বোধের ক্ষতিকর বিষয় তাঁকে এড়িয়ে চ'লতে হবে। সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব বা দায় গ্রন্থাগারিকের নয়, তবু সমাজ সেবাই তাঁর কাজ এবং এ দিকে লক্ষ্য রেখে একই বিষয়ের বিভিন্ন বই বা নানা জাতীয় বই পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর ঝোঁক তৈরী ক'রতে হয় গ্রন্থাগারিককে। সুতরাং গ্রন্থাগারও এক হিসেবে প্রকাশকের কাজ করে। এখানে গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রকাশকের কোনো বিরোধ নেই, বরঞ্চ সাধারণের মনকে পাঠানুরাগী ক'রে তুলে পরোক্ষভাবে বই-এর বাজারকে সাহায্যই করা হয়। অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে গ্রন্থাগার প্রকাশকের ব্যবসা খর্ব ক'রে দিচ্ছে। গ্রন্থাগারে একখানা বই কেনা হ'লে দশজনে পড়বে, প্রকাশক সেজন্য ক্রেতা হারাবেন। আসলে তা হয় না। গ্রন্থাগারের কল্যাণে পুস্তকের প্রচার বেশি হয়, বিজ্ঞাপনের কাজ হয়—নিখরচার বিজ্ঞাপন। এমন কি সাময়িক পত্র-পত্রিকার সমালোচনাতে যে কাজ হয় তার চেয়েও বেশি হয় গ্রন্থাগারের মধ্যস্থতায়। এখানে পাঠক পুরো বইটা দেখতে এবং পড়তে পান, পাঁচটা বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনা ক'রেও পুস্তকের মূল্য যাচাই ক'রতে পারেন। তারপরে দু'দশজন বন্ধুবান্ধবকে স্বভাবতই বইটির কথা বলেন। তাছাড়া, যারা কেবলমাত্র প'ড়তে জানে অথচ বই কেনবার সামর্থ নেই তাদের কাছে পৌছে দেওয়া গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এবং প্রকাশকের বা লেখকের সার্থকতা।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করা নিয়ে। বাংলা বই-এর বাজার এমনিতেই সীমাবদ্ধ, দেশ বিভাগের ফলে আরো খর্ব হ'য়েছে। এককালে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি বই লেখা এবং ছাপা হ'ত বাংলায়। এখনো সে গৌরব কমে যায় নি। হিন্দি বই-এর বাজার এখন বাড়তির দিকে। অনুবাদে এবং নানাবিধ বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ রচনায় হিন্দি ভাষার লেখকদল এখন অগ্রণী। সরকারী উৎসাহ এবং সাহায্যও এই প্রচেষ্টার পিছনে নগণ্য নয়। আমাদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার যে পরিকল্পনা গৃহীত বা স্বীকৃত হয়েছে তাতে সমগ্র শিক্ষাকল্পের সর্ববিধ পুস্তক যদি মাতৃভাষায় না পাওয়া যায় তা'হলে যে কী ধরণের বিপদ ভবিষ্যতে আমাদের হ'তে পারে তার কিছু আভাস উল্লিখিত লেখকদের প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে। এ বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ আছে যে মাতৃভাষায় সহজ ক'রে শিখবার সুযোগ না পেলে পূর্ণ বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ একান্তই দুরূহ হ'য়ে ওঠে? আজকাল আবার এখানকার বাজারে বিদেশী বই পাওয়াও কঠিন হ'য়ে উঠেছে। শুধু সরবরাহের অভাবই নয়, মূল্যাধিক্যও এই মন্দা বাজারের কারণ। দেশের ছেলেমেয়েরা সরকারী বৃত্তি নিয়ে হোক বা অন্যভাবে হোক বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন এবং বিদ্বান বা উচ্চশ্রেণীর কারিগর হ'য়ে আসছেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষালাভ তথা বিদেশের মতো বইপত্র পাবার সুযোগ এখানে নেই। তাহ'লে কি এখানকার শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থেকে যাবেন? বিদেশী ভাষাতে এবং যথাসম্ভব দেশী ভাষায় অনুবাদে তাঁরা যাতে বই পেতে পারেন সে ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। আজকাল বিদেশী ওষুধ-পত্তর, কলকব্জা, সিগারেট প্রভৃতির বিদেশী প্রতিষ্ঠান-গুলির ভারতে ব্যবসা বজায় রাখতে হ'লে এদেশেই উৎপাদনের কারখানা তৈরী ক'রতে হয়। বই-এর বেলাতেও ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। কিছু কিছু নামকরা বা মাৎকরা বই-এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ ক'রতে কোনো কোনো উৎসাহী প্রকাশক এগিয়ে আসেন, কিন্তু তার পিছনে কোনো সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা থাকেনা। ভারত সরকার যদি এ বিষয়ে অবহিত হন এবং গ্রন্থাগার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে বই-এর বাজার প্রসারিত ক'রবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে ইস্কুল-কলেজ, ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের অনেক উপকার হয়। শুধু বিদেশী পুস্তকের এদেশে প্রকাশের ব্যবস্থাই নয়, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে ও সহযোগিতায় যদি ভারতীয়

ভাষাগুলিতে বিদেশী বই-এর বহুল অনুবাদের আয়োজন করা হয় তবে আর সমস্যা এত জটিল থাকেনা। সাধারণত প্রকাশকেরা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদির প্রকাশে খুব বেশি আগ্রহশীল থাকেন না, কারণ বিক্রি সীমাবদ্ধ—আস্তে আস্তে বিক্রি হ'তে থাকে ব'লে অনেক টাকা আটকে থাকে। সরকারী সহায়তা পেলে এবং বিশেষ বিশেষ পুস্তকের অনুবাদের নির্দিষ্ট প্রত্যাদেশ পেলে প্রকাশকদেরও একাজে এগিয়ে আসতে কোনো বাধা বা দ্বিধা থাকবে না।

কিন্তু শুধু পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার পরিকল্পনাই সব নয়, এর সঙ্গে তাল রেখে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিক্ষণীয় বিষয় স্থির ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে বই-এর বাজারের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকাশকদের খুশি এবং ফরমায়েস মতো বই বেরোচ্ছে, বাজার সরগরম হ'চ্ছে। এর ফলেও দেশের অনেক টাকা আবদ্ধ থাকে এবং প্রয়োজনীয় বই প্রকাশ করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনা। বই এবং শিক্ষা উভয়ের একই ব্যবসায়ী ধরন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন শুনি বই-এর বাজার বড় খারাপ, অন্যদিকে তেমনি শুনি শিক্ষা সমস্যার কথা। অথচ রাস্তায় রাস্তায় বই-এর দোকান এবং পরীক্ষা পাশের 'নোট' পুস্তকের ছড়াছড়ি, সস্তা নীচু দরের বই-এর গড়াগড়ি। আবার অন্যদিকে টাইপরাইটিঙের দোকানের মতো পরীক্ষার পড়া তৈরীর অনেক দোকান গজিয়ে উঠেছে। কৃষ্টির অপরাপর অংশগুলিতে একটা সস্তা মনোভাব র'য়েছে, এবং তা র'য়েছে, ব'লেই হয়ত বই-এর বাজারেও সস্তা জিনিসই কিস্তি মাৎ ক'রছে। তার উপরে র'য়েছে নানান নিম্নরুচির সাময়িক পত্রিকা। চারদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম ক'রে নাচ গান প্রভৃতির মারফৎ যে জিনিস পরিবেষিত হয় তার গতি কোন দিকে এবং পরিণতি কী তা একটু লক্ষ্য ক'রলেই বোঝা যায়। একদিকে যেমন তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমাগুলি হাজার হাজার দর্শক আকৃষ্ট ক'রছে, অন্যদিকে তেমনি চটুল গানে বাজার সরগরম। রচনা প্রকাশের ব্যাপারে লেখকদের যেমন স্বাধীনতা নেই, তেমনি ভাল গান বা ভাল ছবির রচয়িতাদেরও নেই স্বাধীনতা। ব্যবসায়ীদের হাতেই এখন কৃষ্টি-সংস্কৃতির ভার ; অর্থোপার্জনই মূল লক্ষ্য। হালকা বিনোদনের মধ্যে অবসর যাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সস্তা বা বিকৃত রুচি সংরুচিকে সহজেই গ্রাস ক'রে ফেলে। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে সহজ লভ্যের প্রতি। সুতরাং পরিণামে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ খর্ব হবার ভয় থাকে।

হালকা রুচি এবং চটুল সামগ্রী সব দেশেই আছে একথা সত্য। কিন্তু এখন আমাদের অন্যদের সঙ্গে তুলনা ক'রবার সময় নয়। ভারতে অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত। অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। এদের অর্থ এবং শিক্ষা কোনো দিকেই ফেলে ছড়িয়ে চলবার মতো অবস্থা আমাদের নয়। সুতরাং সংগঠনের কালটুকু আমাদের নানাদিক বিবেচনা ক'রেই চ'লতে হবে। যা কিছু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বা অগ্রগতির অন্তরায় ব'লে মনে হবে তাই আমাদের নির্মমভাবে বাদ দিতে হবে। সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হ'লে দল বেঁধে হোক আইন ক'রে হোক যা করণীয় তা ক'রতে দ্বিধা ক'রলে চলবে না। বই বা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশকের অভাব পূরণ ক'রতে গ্রন্থাগারকেই প্রয়োজন হ'লে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকাশক বা গ্রন্থাগারের উপরে শিক্ষার ভার যদিও নেই তবুও শিক্ষার আদর্শ সামনে রেখেই তাদের চ'লতে হয়।

কিন্তু গ্রন্থাগারগুলি পুস্তক সরবরাহ ছাড়া এ ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে কতদূর কী ক'রতে পারে? সরকারের মুখাপেক্ষী না হ'য়েও এতকাল ধ'রে এদেশের গ্রন্থাগারগুলি সমাজ সেবার কাজ যে ভাবে ক'রে এসেছে তাতে এমন আশা করা অন্যায় হবে না যে ভবিষ্যতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাদের দান উল্লেখযোগ্য হবে। বিদেশী সরকার যখন আমাদের সমস্যাগুলির প্রতি উদাসীন ছিল এবং উন্নতির পরিপন্থী ছিল তখন অগুনতি পাঠাগারকে কেন্দ্র ক'রে দেশসেবার যাবতীয় কাজ চ'লে এসেছে। এখনও গ্রন্থাগারগুলি বই এবং পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ক'রতে পারে। ভালো ভালো গানের রেকর্ড সংগ্রহ এবং তা শোনবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, নানান ভাষাশিক্ষার রেকর্ড রাখা এবং সেইসূত্রে ভাষা শেখবার ব্যবস্থা করা, বিশেষ বিশেষ জিনিসের টেপরেকর্ডের সংগ্রহ এবং টেপ-রেকর্ড ক'রবার ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। ভালো ভালো শিল্পীদের আঁকা বাঁধানো ছবির সংগ্রহই শুধু নয়, সেই ছবি যাতে বই-এর মতোই ধার ক'রে নিয়ে গিয়ে বাড়ি সাজাতে পারে সেদিকে নজর দিলে রুচি সৃষ্টির কাজ হ'তে পারে। রুচি তৈরীর সহায়ক হিসেবে সিনেমার ছবির সংগ্রহ এবং তা দেখাবার বন্দোবস্ত থাকা নিশ্চয় দরকার। তাছাড়া বক্তৃতাদির আয়োজন, নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মাঝে মাঝে নাটক মঞ্চস্থ করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রন্থাগারগুলিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার মধ্যে ব্যবসায়ী

মনোবৃত্তির স্থান নেই ব'লেই সবের মধ্যে দিয়ে রুচিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ রচনা এবং সুশিক্ষার প্রচার সম্ভব হ'তে পারে।

আমি গ্রন্থাগারগুলিকে এর চেয়েও বেশি দায়িত্ব নেবার কথা বলি। পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারেও যদি গ্রন্থাগার অগ্রণী হয় তবে জনসাধারণের প্রভূত উপকার হ'তে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটু বাড়াবাড়ি ব'লে হয়ত মনে হ'তে পারে, কিন্তু একটু বিবেচনা ক'রে দেখলেই এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশয় থাকে না। প্রকাশককে নানান দিক ভেবে চ'লতে হয়, তাই অনেক বই তার পক্ষে ছাপানো সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। পাঁচ রকমের পাঁচটা বই বার করা এবং একটা বই-এর তেলে আরেকটা বই-এর মাছ ভাজাই তাদের কাজ। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। তাই অতিরিক্ত মুনাফার দিকে যেমন তাকে নজর দিতে হবে না, তেমনি বাজার মাৎ ক'রবার জন্য পাঁচমিশেলি বইও তাকে বার ক'রতে হবে না। বিশেষ বিশেষ বই গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত হ'লে সাধারণে তা স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ ক'রতে পারবে, এমনকি গ্রাহকদের পক্ষে কিস্তিবন্দীতে টাকাটা দেবার সুবিধেও ক'রে দেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে যত গ্রন্থাগার আছে সেগুলির থেকে যদি কয়েকখানা ক'রেও মূল্যবান মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বই-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—দেশটাও ভালো বই-এর দুর্ভিক্ষ থেকে কিছু পরিমাণে রক্ষা পাবে।

বই-এর আঙ্গিক বিভ্রাট

এক কালে বই-এর বাজারে তার পোশাকি চেহারাটার দিকে নজর দেবার তেমন ঝোঁক ছিল না। বইকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ক'রে বাজারে হাজির ক'রবার ঝোঁক সুরু হ'য়েছে হালে। অভিজাত কিছু বই খরচ-খরচা ক'রে ছবি-টবি দিয়ে বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখে বার করা হ'লেও তার সংখ্যা ছিল নগণ্য। এখন বই-এর অঙ্গসজ্জার কায়দা-কানুন অভিনব হ'য়ে উঠেছে, হ'য়ে উঠেছে মনোমুগ্ধকর। প্রকাশনের বাজারে ঢেউ উঠেছে প্রতিযোগিতার। বই-এর এই শোভনতা,—সেকালের মুষ্টিমেয় বই-এর ক্ষেত্রে যেমন এখনো তেমনি, পুস্তকের প্রয়োজনে তত নয় যতটা ক্রেতা বা বিক্রেতার বাহাদুরির অঙ্গ হিসেবে। এগুলি শুধু পড়ুয়ারই মনোহরণ করে না,—আর পাঁচটা আসবাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাজানো কামরার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। ক্রেতার পকেটের দিকে নজর রেখেই সস্তার বৈচিত্র্য। এবং তা সম্ভবও হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে নানারকম স্বল্প মূল্যের সামগ্রী বাজারে বেরিয়েছে ব'লে। প্রচেষ্টাটা সস্তায় সাধারণের হাতে মনোরম গ্রন্থ তুলে দেবার দিকে, যদিচ সাম্প্রতিক বাংলা বইএর বহর দেখে সেটা আর অনুভব ক'রবার উপায় থাকছে না। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বই, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের বই এবং অনুরূপ কিছু পরিমাণ বাংলা বই ছাড়া আমরা সস্তা দামের বই দেখতে পাই অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষার বইএর বাজারে। কিন্তু শেষোক্তগুলির দশা যেমন দীন চেহারাও তেমনি হতশ্রী। পক্ষান্তরে চেহারায় জৌলুষ থাকলেও বাংলা বই-এর বাঁধাই সেলাই পলকা।

পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে নূতনত্বের এবং বৈচিত্র্যের আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা। সস্তা দামের বই থেকে মনোহর গ্রন্থ সবেতেই কত রকমের কারিকুরি। শুধু বাঁধাই-এর অভিনবত্ব কিংবা চটকদার মলাটেই নয়, অঙ্গসজ্জার রকমারি কেরামতি দেখেও অবাক। এই বৈচিত্র্যের ঢেউ এসে অন্তত বাংলা বইএর বাজারে লেগেছে সন্দেহ নেই। বিশেষ ক'রে ছোটদের বই-এ এই মার্কিনী জমকালো ঢং লক্ষণীয়। পুরানো ধাঁচে কিংবা নূতনতম

কায়দায় অক্ষর ঢালাই ক'রে চিত্রে বর্ণে অভিনব ধারা আবিষ্কার ক'রে তাঁরা পাঠক মহলের মনোরঞ্জন ক'রতে চান। অনেক সময়ে এই অভিনবত্বের জোয়ার গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'একটা নতুন কিছু করো'র পর্যায়ে ঠেকে।

কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয় প্রকাশনের এই অভিনবত্ব অথবা অঙ্গসজ্জার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নয়। প্রকাশ বৈচিত্র্যে আঙ্গিকের যে সব হেরফের রদ-বদল অথবা আপাত উদ্ভট কায়দা দেখা যায় তার ফলে পাঠক এবং গ্রন্থাগারিক কিভাবে মুশকিলে পড়েন এবং কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন সেটাই আমার আলোচ্য। সেদিন একখানা বই হাতে এল, নাম-ধাম-গাঁই-গোত্র নিম্নোক্তরূপ :—

You and atomic energy and its wonderful uses, by John Lewellen, drawings by Lois Fisher. Children's Press, Inc. (copyright 1949)। লক্ষণীয়, বইটিতে প্রকাশকের নাম এবং কপিরাইট তারিখ দেওয়া থাকলেও কোন্ শহর থেকে প্রকাশিত উল্লেখ নেই (শুধু Printed in U. S. A. লেখা আছে)। কিন্তু উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব বইটিতে পৃষ্ঠাঙ্ক নেই,—সমগ্র বই-এর কোন অংশেই নয়। এসবের নির্দেশ আছে জ্যাকেটে—শিকাগো, ৪২ পৃষ্ঠা, বোর্ড (বাঁধাই), (মূল্য) ৬০ সেণ্ট। দামটা জ্যাকেটে, লেখা তাবৎ ইংরেজি বই-এর রেওয়াজ। হয়তো এই অনুকরণেই বিশ্বভারতী প্রকাশিত বই-এর দাম আজকাল পুস্তকের শেষে বাঁধাই-এর পিছন দিকে লেখা হয়; এতে চট ক'রে দামটা দেখে নিতে সুবিধে হয়, বিশেষ ক'রে বিক্রেতার পক্ষে।

উক্ত বইটির বেলায় কিন্তু অসুবিধা অনেক, বিশেষ ক'রে গ্রন্থাগারের পক্ষে এবং দপ্তরীর তরফে। ক্যাটালগ করার সময়ে না হয় আপনি জ্যাকেটের নির্দেশ অনুযায়ী লিখে রাখলেন কোথায় প্রকাশিত, কত পৃষ্ঠা; যে কোনো বই-এর বেলাতেই তা ক'রতে হয়। পড়ুয়ার তরফ থেকে খুঁটিনাটি জানতে হ'লে সাধারণত বই ছেড়ে ক্যাটালগের শরণ নিতে হয় না,—যেটা এ বইটির বেলায় অনিবার্য। অসুবিধা হয় পাতার হিসাব ক'রতে গিয়ে। পড়ুয়ার কাজের জন্য পত্রাঙ্ক দরকার। আপনি যদি বই-এর কোনোও অংশ উল্লেখ ক'রতে চান তবে পৃষ্ঠাও উল্লেখনীয়। এক্ষেত্রে যদি সেরকম দরকার পড়ে তবে পংক্তি গুণে নেবার মতো পৃষ্ঠাও গুণে নিতে হবে। কিংবা ধরুন আধুনিক কায়দায় বই-এর

পৃষ্ঠা না কেটে বই বার করা হয় ব'লে যেমন গ্রন্থাগার-কর্মীর কর্তব্য পাতা কেটে রাখা, তেমনি তাঁকে পত্রাঙ্কও লিখে রাখতে হবে সারা বই জুড়ে। সব চেয়ে অসুবিধা বাঁধাবার বেলায়, কারণ বইটিতে পত্রাঙ্ক যেমন নেই, 'সিগনেচার' চিহ্নও নেই। তবে মার্কিনী পকেটের অনুপাতে বইটির যা দাম তাতে আবার বাঁধানোর থেকে নূতন আরেকটা কিনে নেওয়া অনেক সস্তা। কিন্তু এই নূতন কায়দা অন্য কোনও বৃহৎ গ্রন্থে সংক্রামিত হ'তেই বা কতক্ষণ?

শুনেছি আধুনিক কাব্য নাটক উপন্যাসের সাম্প্রতিকতম স্রোতোবেগে ফরাসী ঔপন্যাসিক এমন কায়দায় যদৃচ্ছ কলমের আঁচড় কাটছেন যাতে বই-এর দৈর্ঘপ্রস্থের কোনো হিসাব থাকছে না। বাঁধানোরও প্রয়োজন হচ্ছে না,—পাতাগুলো আলগাভাবে নথি বন্ধনে থাকছে। তাঁদের বক্তব্য, জীবনের জোয়ারে যেমন ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকে না, এক প্রসঙ্গ বা এক প্রেম যেমন আবার ফিরে আসে না, তেমনি গল্পেরও ধারাবাহিকতা অথবা পরিণতির কিছু প্রয়োজন নেই। হিন্দী সিনেমার মতো যখন যেখান থেকে খুশি শুরু ক'রলে ক্ষতি নেই,—পরম্পরা থাক বা না থাক ঘটনা থাকছে, কাহিনীও থাকছে, দু'চারটে পাতা বাদ প'ড়ে গেলেও 'আপনি কী হারাইতেছেন তাহা বুঝিবার' কিছু নেই। কিন্তু বইতো জীবন নয়, গ্রন্থাগারও সেই স্রোতে ভেসে চলবার নয়। তাই বই পড়ার এই ধরনের 'আড্ডা'তে তার সার্থকতা থাকে না।

বই-এর আইন অনুযায়ী বই প্রকাশিত না হ'লে একটু অস্বস্তি ভোগ ক'রতে হয় বইকি। বিশেষত গ্রন্থাগারিককে। বাংলা বই-এর বাজারে একটা নূতন কায়দা আজকাল চালু হ'য়েছে। বই-এর ধরন বা গড়নের একটা যে সাধারণ নিয়ম আছে সেটা সব সময় মেনে চলা হয় না। ইংরেজি বই-এর বাজারে এটা তত বেশী চোখে না প'ড়লেও এই অভিনবত্বের সূত্রপাত সাগরপারে। প্রকাশ-বিজ্ঞানের ঢালা পথে চ'ললে আমরা বই খুললেই নামপত্র, পরিচয়পত্র এবং প্রকাশনার খুঁটিনাটি, সূচীপত্র ইত্যাদি যেভাবে পাবার ভরসা রাখি, নূতনত্বের দাবীতে সেই বাঁধা সড়ক ছেড়ে একটু এপাশে ওপাশে চ'লতে হচ্ছে। প্রকাশকের লক্ষ্য বইটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সকলের নজরে ধ'রে দেওয়া, যাতে প্রথম দর্শনেই বইটি ক্রেতার ভালো লেগে যায়। কিছুকাল আগেও বই খুললেই দেখা যেত গ্রন্থের যাবতীয় বিবরণ—মায় মূল্য সমেত সবই আখ্যাপত্রে বা 'টাইটেল' পৃষ্ঠায় উল্লিখিত। এখন সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য নানারকমভাবে বইএর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজানো

হচ্ছে। সিগনেট প্রেসই বোধ হয় প্রথম ব্যাপকভাবে এটা শুরু করে, এবং দেখতে পাই আজকাল বাজারের বেশির ভাগ বই-এরই তথ্যপঞ্জী থাকে পরিচয়পত্রের অপর পৃষ্ঠায় এবং সেখানে প্রকাশক, শিল্পী, মুদ্রক থেকে শুরু ক'রে দপ্তরী পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বই-এর তথ্য সন্ধানে এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমে বইকে আরও সুন্দর ক'রবার দিকে প্রকাশকদের নজর গেল এবং কে কত সুন্দর অঙ্গসজ্জা ক'রতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল প্রকাশক মহলে। প্রচ্ছদসজ্জার রুচি বিচিত্রতর পথ খুঁজল। আপনি বই হাতে নিয়ে এখন আন্দাজেই বলতে পারেন এটি সিগনেটের বই, এটি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড অথবা বেঙ্গল পাবলিশার্সের, ওটি ক্যালকাটা বুক ক্লাব বা নাভানার। অঙ্গসজ্জার বহু পুরস্কার এল বাংলাদেশে। আমাদের ভালো লাগল সিগনেটের রুচি তার বহুবিধ বইএ, "প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে নাভানার উৎকর্ষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "চেনামহল", "মলাটের রঙ", শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের "সমুদ্রের গান" প্রভৃতি ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রকাশিত বই-এর প্রচ্ছদসজ্জার অভিনবত্ব। যার জন্য মণীন্দ্র মিত্র প্রমুখ উৎসাহী শিল্পী এবং সত্যজিৎ রায় প্রমুখ রুচিবান আঁকিয়ে প্রশংসার্হ।

বই সম্বন্ধে আজকালকার সমালোচককে একথা অন্তত ব'লতেই হবে, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট—অঙ্গসজ্জা নিখুঁৎ। নূতনত্বের বন্যায় কি রকম বই আমাদের হাতে ভেসে আসছে, ইতস্ততঃ অনায়াস দৃষ্টিপাতেই তার নজির মিলবে। এবং দেখতে পাব, এর ফলে বই-এর থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়তে বসেছে। পাঠক দেখছেন, কষ্ট ক'রে না প'ড়লে বিত্তের কেষ্ট লাভ হয় না। বিভ্রান্ত বোধ করেন গ্রন্থাগারিক। যেমন ধরুন, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দুটি গল্পগ্রন্থ, 'প্রচারিকা' প্রকাশিত "একুল ওকুল" এবং ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রকাশিত "মলাটের রঙ"; বই দু'টিতে সূচীপত্রের বালাই নেই, ভিতরের কোনোও পাতায় বইএর বা গল্পের নাম, অর্থাৎ টানা নামাঙ্ক বা 'রানিং টাইটেল' নেই। কিংবা ধরুন, নতুন সাহিত্য ভবন প্রকাশিত সমুদ্র গুপ্তের "শহর কলকাতার আদিপর্ব"—যাতে অধ্যায় বিভাগ থাকলেও সূচীপত্র এবং টানা নামাঙ্ক নেই। সত্যব্রত লাইব্রেরী প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের "উষালগ্ন" অথবা রমাপদ চৌধুরীর "ঝুমরা বিবির মেলা"; ন্যাশনাল পাবলিশার্স প্রকাশিত সরোজ আচার্যের প্রবন্ধগ্রন্থ "বই পড়া"; —এগুলিতে পত্রাঙ্ক বর্জিত সূচীপত্র আছে, কিন্তু বইএর ভিতরে টানা নামাঙ্ক

নেই। সুতরাং গল্প-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া সূচীপত্রের সার্থকতা নেই। আবার দেখুন, সিগনেট প্রেসের বই জীবনানন্দ দাসের "কবিতার কথা" এবং সুকুমার রায়ের "বর্ণমালা তত্ত্ব", অথবা 'স্বাক্ষর' প্রকাশিত অশোক মিত্রের "পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা" এবং "ভারতের চিত্রকলা",—এই বইগুলিতে সূচীপত্র আছে, তাতে পত্রাঙ্ক নির্দেশও আছে, কিন্তু টানা নামাঙ্ক নেই।

ইংরেজি বইতেও এ ধরনের নজির আছে। যেমন, লণ্ডনস্থ Secker & Warburg প্রকাশিত George Orwell-এর বই Animal Farm, যাতে টানা নামাঙ্ক নেই। মস্কো এবং পিকিং থেকে আজকাল বাজারে যে সব বই আসে তার মধ্যে বেশীর ভাগ বই খুললেই দেখা যায় সূচীপত্রাদি পরিপাটি-ভাবে থেকেও টানা নামাঙ্ক নেই। ফরাসী বা অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষার বই-এর বেলায় এ ব্যাপার আরও ব্যাপক। আখ্যাপৃষ্ঠা ছাড়া আর কোথাও পুস্তকের নাম গন্ধ পাই না। যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে Amsterdam থেকে W. Versluys প্রকাশিত Frederik Van Eeden কৃত Huis en Wareld, Editions du Seuil, Paris প্রকাশিত Pierre Teilhard de Chardin-এর La Vision du Passe, ইত্যাদি। ইংরেজি উল্লেখযোগ্য বই-এর মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Doubleday & Co-র বই Andre Malrauxকৃত, 'The Voices of Silence', Museum of Modern Art-এর বই Alfred J. Barr, Jr. কৃত 'Matisse, his art and his public', লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Thames & Hudson-এর 'Picasso', প্রভৃতি বহু পুস্তকে এই ধরনের অসঙ্গতি দেখা যায়। Perkins প্রকাশিত সুখ্যাত বই Berthold Laufer কৃত 'Jade' দেখুন,—সূচীপত্র আছে, কিন্তু টানা নামাঙ্কে শুধু মূল বই-এর নাম, অধ্যায় নির্দেশ নেই। নিউইয়র্ক Pynson Printers প্রকাশিত Dard Hunter-এর বই Papermaking by hand in India গ্রন্থাগারবিশারদের লেখা হ'য়েও টানা নামাঙ্ক বর্জিত। এধারে ১৯৪৮-এ প্রকাশিত লখনৌ ইতিহাস পরিষদের বই বাসুদেব অগ্রবালের Gupta Art বইটিতে ভিতরে কোনো টাইটেল পৃষ্ঠাই নেই। একমাত্র প্রচ্ছদ ভরসা।

নানাবিধ গ্রন্থের নাম ক'রতে গেলে তালিকা লম্বা হ'তে থাকবে। এই সব বই হাতে এলে দেখতে বেশ লাগে, একটু কষ্ট ক'রে গ্রন্থাগারকর্মী ক্যাটালগও ক'রে ফেলেন। কিন্তু নির্দেশনা বা রেফারেন্সের প্রয়োজন হ'লে মুশকিলে

প'ড়তে হয়। আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনোও গল্প প্রবন্ধ বা পরিচ্ছেদের বিশেষ কোনোও অংশ দেখতে চান তবে খুঁজে বা'র ক'রতে হবে। কিংবা নিজেই একটা নির্দেশিকা বা পাঠসূচী তৈরি ক'রে নিতে হবে। আপনি উল্লেখ ক'রবার সময়ে একবার খুঁজে নিয়ে হিসাব ক'রবেন, পাঠক তা প'ড়বার সময়ে আরেকবার খুঁজে নেবে। আরেক বিপদ, আখ্যাপত্র যদি কোনোও ক্রমে একবার নষ্ট হ'য়ে যায় তবে বই পঙ্গু।

বাংলা পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় ভেবে দেখা দরকার। প্রয়োজনটা গ্রন্থাগারের জন্য তো বটেই, সাধারণের উপকারের কথা ভেবেও। এখানে 'সংস্করণ' ব'লতে প্রকাশকেরা আসলে 'পুনর্মুদ্রণ' বোঝেন। 'সংস্করণ' (edition) আর 'পুনর্মুদ্রণের' মধ্যে তফাৎ কোথায় সকলেই জানেন। 'সংস্করণ' তখনই লেখা চলে যখন বইটিকে পুনরায় মুদ্রিত করার সময়ে কোনো অংশের সংস্কার করা হয়—পরিবর্ধন বা পরিবর্জন ক'রে নূতন রূপ দেওয়া হয়। আর 'পুনর্মুদ্রণ' প্রথম প্রকাশিত বইটিরই যথাযথ মুদ্রণ (reprint)। বিশ্বভারতী এই নিয়মটি মেনে চলে। এবং এখন অনেক প্রকাশকই এ সম্পর্কে অবহিত।

এই সঙ্গে প্রকাশকালের কথাও ব'লতে হয়। প্রকাশকাল গ্রন্থের, বিশেষ ক'রে প্রবন্ধাদি গ্রন্থের, পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ নিয়ম দেশীয় প্রকাশকেরা বড় একটা মেনে চলেন না। বাংলা বই—বিশেষ ক'রে উপন্যাসাদির ক্ষেত্রে এটি প্রকাশক আর উল্লেখ করেন না, হয়তো জানাতে চাননা এই ভেবে যে পুরানো তারিখ দেখলে ক্রেতা ভাববেন বইটি তা'হলে বিক্রি হয় না, সুতরাং কিনবেন না। যাঁরা প্রকাশকাল উল্লেখ করেন তাঁরাও সাল, শক, খ্রীষ্টাব্দ, বুদ্ধাব্দ, চৈতন্যাব্দ প্রভৃতি বিচিত্র বর্ষপ্রকরণ যেমন দেন তেমনি আবার মহালয়া, রথযাত্রা, শ্রীপঞ্চমী, বুদ্ধ-পূর্ণিমা প্রভৃতি বিচিত্রতর কালোল্লেখ করেন। ফলে সঠিক তারিখ হিসাব ক'রে বার ক'রতে গ্রন্থাগারকর্মী বা গবেষক হিমসিম খান। সংস্করণ-প্রমাদ এবং প্রকাশকালের অনুল্লেখের উদাহরণ প্রচুর দেওয়া যেতে পারে, সকলেরই হাতে এ ধরনের বই আসে, তাই আর উল্লেখ ক'রলাম না। ছোটগল্পের সংগ্রহগ্রন্থে প্রকাশকরা সূচীপত্র সংযোগ করেন না সম্ভবত ঐ একই মনোভাববশত। কেননা, শোনা যায়, ছোট গল্পের বই বিক্রি হয় না, উপন্যাসই ক্রেতারা চান। তাই ক্রেতার

বিভ্রমের সুযোগ নিতে চান ঝানু প্রকাশক। শুধু তাই নয়, কিছু খ্যাতনামা লেখকের গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ আছে যেগুলি শুধু নামকরণেই স্বতন্ত্র,—ভিতরের গল্পগুলি অন্য নামে প্রকাশিত গ্রন্থেরই পুনরাবৃত্তি। এটা দেখা যায় "শ্রেষ্ঠ গল্প", "সুনির্বাচিত গল্প", "স্বনির্বাচিত গল্প" প্রভৃতির বেলায়। এমন কি, হুবহু একই বই পুনর্মুদ্রণে (যা কিনা 'সংস্করণ' আখ্যা প্রাপ্ত) নাম বদলে বাজারে নবচর্চিত মুখে হাজির হচ্ছে।

অভিনবত্বের জোয়ারে আবার আরেক চমকও ভেসে আসছে বই মহলে। একটি বই-এরই দু'দিকে দু'টি বই, দু'দিকের মলাট দু'রকম। সামনের দিক থেকে একটা বই এসে মাঝখানে শেষ, পিছন দিক থেকে আরেকটা বই এসে মধ্যস্থলে সমাপ্ত। যেমন Rupa Paper Back গ্রন্থমালাবর্তী (Rupa & Co., Calcutta প্রকাশিত) Anais Nin-এর The four chambered heart এবং Children of the Albatross—দু'টি বড় গল্প সাধারণ পদ্ধতিতে একটির পর একটি প্রকাশিত না হ'য়ে দু'দিকের মলাট থেকে আলাদা ভাবে শুরু হ'য়েছে। তবে এই বইটি সম্পর্কে গ্রন্থগারিকের দৃষ্টিকোণ থেকে নালিশ ক'রবার কিছু নেই, কেননা আখ্যাপত্র, সূচী ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সবই প্রায় যথাযথভাবে বর্তমান। সুতরাং বিশ্লেষপত্রক (analytical card) দিয়ে যথানিয়মে এটির গ্রন্থায়ন কৃত্য সম্পন্ন করা যায়। নানাবিধ নির্দেশ দেওয়া ছাড়া আর বেশী কিছু অসুবিধা হয় না।

তবে এজাতীয় চমকসৃষ্টির ঝোঁক প্রকাশকদের যত বেশী হবে ততই গ্রন্থাগারবিশারদের কাজ জটিল হবে। গ্রন্থসূচীকরণ ও বিন্যাসে গ্রন্থাগার-কর্মীকে নানারকমভাবে গ্রন্থাভ্যন্তর পরীক্ষা ক'রতেই হয়, তার সূচীপত্র থেকে শুরু ক'রে যাবতীয় বিবরণ পার হ'য়ে নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জী সব কিছু খুঁটিনাটি দেখতে ও লিপিবদ্ধ ক'রতে হয়। বই-এর মাপ ও আকার প্রকার যেমন দেখতে হয় তেমনি গ্রন্থগুলির প্রবেশকপত্রসংখ্যা ও পৃষ্ঠাসংখ্যাও গুণে গেঁথে হিসেব ক'রে নিতে হয়। এই পত্রসংখ্যাও বিচিত্র, কখনো /০, ⁄/০, ৶০, ইত্যাদি পর্যায়ে চলে, কখনো (ক), (খ), (গ), ইত্যাদি পর্যায়ে চলে, কখনো বা দেবনাগরী হরফে তার পর্যায়ক্রম। বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন পত্রাবলীর নজিরও মেলে। একটা ঐকধারাসূত্র থাকলে সব দিক দিয়ে সকলের পক্ষেই সুবিধা হয় সন্দেহ নেই। মানুষ একঘেয়েমি এড়িয়ে চ'লতে চায়, নূতনত্বের আমদানি

করে। নূতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য অনেক নূতন নিয়ম চালু ক'রতে হয়। বই-এর বাজারেও অভিনবত্বের আমদানি হ'তে থাকবে, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রন্থের মর্জি বুঝে গ্রন্থাগারিক সূচীকরণের নব নব সূত্র তৈরি করবেন।

ডিউই বর্গীকরণ ঃ ভারতবর্ষ ও এশিয়া

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ একাদশ সংখ্যায় 'ডিউই বর্গীকরণের ৮১০ ও দেশীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সেন লিখিত মন্তব্য পড়লাম। এ প্রসঙ্গে গুটিকতক কথা নিবেদন করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ অথবা যে কোনো বিদেশীয় বর্গীকরণ পদ্ধতিতেই ভারতীয়—ব্যাপকভাবে এশীয়—বিষয়াবলীর স্থান এবং বিভাগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। বিশেষত এযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে জ্ঞানাত্মীয়তার বিবেচনায় একটি সর্বজনীন সর্বকালীন পদ্ধতির অভাব গ্রন্থজগতে স্বভাবতই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। সম্প্রতি এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে এটা খুবই আনন্দের কথা। এ নিয়ে 'গ্রন্থাগার' এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু আলোচনাও হয়েছে। এবং সভা সমিতিতেও বিষয়টি একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার চতুর্দশবর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলা সাহিত্যের বর্গীকরণ ও ডিউই' প্রবন্ধটিও এই সূত্রে উল্লেখ্য। তিনি সুনিপুণভাবে বর্গীকরণের মূল উদ্দেশ্য কি এবং বিচার বিবেচনা কোন খাত ধ'রে হওয়া উচিত তার আলোচনা করেছেন। এবং শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সেন তাঁরই বক্তব্যের রেশ টেনে ৮১০ বিভাগটির ভারতীয়করণের সূত্র নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বর্গীকরণের এই প্রস্তাবাদির সূত্রে কেউই এযাবৎ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নি। ৮১০কে তালিকায় রূপ দেবার সময়ে অথবা ডিউইতে বাংলা সাহিত্যের স্থান নিরূপণের চিন্তায় কা'রোই তাঁর কৃত তালিকার কথা মনে পড়েনি। অথচ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের নাম এবং গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর চিন্তা, অবদান এবং ব্যবহারিক কৃতিত্বের কথা কা'রো অজানা থাকবার কথা নয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার কার্যকরীভাবে যুক্ত থেকেছেন। ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে এ পর্যন্ত যাঁরা চিন্তা করেছেন এবং বর্গীকরণের মান এবং স্থান নির্ণয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথম সারিতে।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির একটি সম্প্রসারিত রূপ খাড়া ক'রে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন এবং সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সেটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে চালু করেন। সেই পদ্ধতি অদ্যাবধি এখানে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। এর সফলতা এবং রূপায়ণের সার্থকতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। কেননা এযাবৎ অবারিত-দ্বার উন্মুক্ত-মঞ্চ এই গ্রন্থাগারে এই সহজ সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুযায়ী বর্গীকৃত বই-এর ব্যবহারে পাঠক বা গ্রন্থাগারের কর্মীপক্ষে কা'রো কোনো অসুবিধা হয়নি। বর্গীকরণ সূত্রের ভিতরের কথাটা—বিজয়নাথ বাবু যা'কে ব্যাঙ্গার্থ প্রভৃতির উপমায় স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছেন—তা ধরতে সেকালের সচেতন গ্রন্থাগার-মনীষী প্রভাতবাবুর বিলম্ব হয়নি। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ৮১০ বিভাগে স্থান দিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যকে। এবং এই ধারা বজায় রেখে ৪১০ বিভাগে স্থান দিয়েছেন ভারতীয় ভাষাবর্গের। শুধু তাই নয়, ১৮২ তে ভারতীয় দর্শন, ২২০ থেকে ২৯০ পর্যন্ত বিভাগের পুনর্বিন্যাস ক'রে সেখানে ভারতীয় ধর্মগুলির স্থান (সাহিত্যের মতো ধর্মও ডিউইতে খ্রীষ্টপ্রভাবে কোণঠাসা), ৩৫৪ ও ৩৭৪এ যথাক্রমে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শন, (বস্তুতপক্ষে ৩৫০ বর্গের-পুনর্বিন্যাস করেছেন তিনি), ৯৫৪তে ভারতীয় ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়েরও বর্গ-সন্নিবেশ ক'রেছেন। (ডিউইতে অবশ্য এখন ৯৫৪ বর্গের বিস্তারিত বিভাগ সন্নিবেশিত হয়েছে)। এবং এই ধারা অনুসরণ ক'রেই দ্বিবিন্দু বিভাগের প্রবর্তন ক'রে বাংলা প্রভৃতি ভাষার এবং সংস্কৃতের বর্গীকরণের সূত্র প্রস্তুত ক'রেছেন। বিশ্বভারতীর বাংলা এবং, বিশেষ ক'রে, সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার যেমন কার্যকারিতায় বিশিষ্ট তেমনি বৈজ্ঞানিক। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় প্রভাতবাবুর হিন্দী গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতিও চালু হয়েছে। বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণের মতো হিন্দী গ্রন্থ বর্গীকরণেরও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং এটিও এখানকার (শান্তিনিকেতনের) হিন্দী গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডিউই বর্গীকরণে, এবং অল্পবিস্তর সব বর্গীকরণ পদ্ধতিতেই গ্রন্থাঙ্ক নামটি আকারে বড় হ'য়ে যায় ব'লে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার কথা গ্রন্থবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন, কিন্তু সবদিক বজায় রাখবার মতো সরল সূত্র তৈরি করা দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। প্রভাতবাবুও কাজ সহজ এবং সরল ক'রবার

জন্য ডিউইর সঙ্গে কোলন মিশ্রিত ক'রে নিয়েছেন (ইউ ডি সি লক্ষণীয়)। এতে বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝবার কাজ যেমন পরিচ্ছন্ন হয়েছে তেমিন গ্রন্থাঙ্ক নামটিও অনর্থক লম্বা হ'য়ে যায়নি। যেমন, ৯৫৪.১—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, ৯৫৪.১ : ১০—সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ৯৫৪.১ : ২০—ধর্মীয় ইতিহাস, ৯৫৪.১ : ৩৯—জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি। যেমন, ডিউইতে অর্থ-নৈতিক পরিসংখ্যানের জন্য গ্রন্থাঙ্ক হয় ৩১১.০০০১৩৩, সেখানে সহজেই আমরা ৩১১ : ৩৩ দিতে পারি।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত ইংরেজী বর্গীকরণের সাইক্লোস্টাইলে ছাপানো কয়েকটি বই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানে তার একটি ক'রে বই তখন পাঠানোও হয়েছিল। যতদূর জানি তাঁর পদ্ধতিটি এখন বই হিসাবে ছাপা হবার অপেক্ষায় রয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর এই সম্প্রসারিত ডিউইর রূপ নিয়ে নানান জায়গায় আলোচনা হয়েছে। কয়েক বছর আগে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ-নিযুক্ত লাইব্রেরি কমিশন যখন বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তখন এটি নিয়ে তাঁরা প্রভাতবাবুর সঙ্গে আলোচনা ক'রে গিয়েছিলেন এবং সম্ভবত এর একটি প্রতিলিপিও নিয়ে গিয়েছিলেন। এই কিছুকাল আগেও ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে কলকাতায় (হিন্দী হাইস্কুল গৃহে) এটি আলোচিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' গ্রন্থে ডিউইর ভারতীয়-কৃত একটি রূপ খাড়া করেছেন। এসবের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা ক'রে একটি সর্ব-ভারতীয় বর্গীকরণ পদ্ধতি তৈরি করা খুবই দরকার। প্রভাতবাবু-কৃত পদ্ধতিটি দীর্ঘকাল ধ'রে ভারতের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে, বিশ্বভারতীতে, ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। সুতরাং বর্গীকরণ সূত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই কার্যকর রূপটির দাবী যে সবার আগে সে বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত।

এই নিয়ে আরো একটি বৃহত্তর আলোচনার চেষ্টা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। কিছুকাল আগে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের ডিউই বিশারদ শ্রীমতী সারা ভাণ এদেশে এসে দেশীয় প্রয়োজনের অনুকূলে কিভাবে ডিউইর সংশোধন সংযোজন করা যায় তার জন্য সরেজমিনে জরিপ ক'রে গিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ডিউইতে এশীয় বিষয়ের স্থান নিরূপণ। তিনি বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে কিভাবে ডিউই প্রযুক্ত হচ্ছে তার সমীক্ষা করেছেন এবং সিংহল, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া

প্রভৃতি অঞ্চলেও এই উদ্দেশ্যে সফর করেছেন। শ্রীমতী ভাগের সমীক্ষা সূত্রে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় বিদ্যাভবন, টাটা সমাজবিদ্যা কেন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থাগারে ডিউইর বিশেষ ব্যবহারের উল্লেখ দেখেছি। কিন্তু প্রচার-নিরপেক্ষ অথচ প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে সুপ্রাচীন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কথা কোথাও উঠেছে ব'লে জানিনা। শ্রীমতী সারা ভাগের সমীক্ষাসূত্রে বোম্বাই গ্রন্থাগারিকরা যে কয়টি সংশোধনী প্রস্তাব ক'রেছেন তার মধ্যে আছে ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, বিবিধ দর্শন প্রভৃতির জন্য স্থান সঙ্কুলান ও বিশেষ বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা। বিশ্বভারতীর পদ্ধতির বিচার ক'রে দেখলে এ ব্যাপারে কার্যকর নির্দেশ কিছুটা পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

একথা ঠিক যে কোনো রীতিই চিরন্তনতার দাবী ক'রতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অধুনাতন চিন্তাশীল পূর্বতন প্রাজ্ঞের রীতি পদ্ধতিকে নিপুণতরভাবে প্রয়োগ ক'রবার ইঙ্গিত দেন। ডিউইর সংস্করণগুলির ক্রমিক পরিবর্তন পরিবর্ধনই তা প্রমাণিত করে। একদা যে রীতি আমেরিকাতে প্রবর্তিত হয়েছিল তা আজ বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহারোপযোগী ক'রবার জন্য চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমেরিকাতে ছিলাম তখন পরিচয় হয় লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের কর্মী, ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রকল্পের সহকারী সম্পাদক শ্রীমতী মেরী এঙ্গলেমেয়ারের সঙ্গে। বর্গীকরণ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এখানকার ডিউই স্বাঙ্গীকরণ সূত্রে আমি যখন তাঁকে বলি যে বিভিন্ন বিষয় বিভাগগুলিকে আমরা ভারতীয়করণ ক'রে নিয়ে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতির জন্য বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছি, এবং ৮১০ কে ভারতীয় সাহিত্যের জন্য ব্যবহার ক'রে মার্কিন সাহিত্যকে ৮২০র মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছি তখন তিনি এবং আরও অনেকে বলে ওঠেন, সে কী—মার্কিন সাহিত্য যে ইংরেজি সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁকে আমি স্বাভাবিক যুক্তি দিয়েই বুঝিয়েছিলাম যে ডিউই তাঁর বর্গীকরণে যে কারণে আমেরিকা এবং পশ্চিমার্ধকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেই কারণেই আমরা ভারত ও এশিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি। বর্গীকরণের সঙ্গে বর্গীকৃত দেশ ও তার জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গতি বজায় রাখাই মূল নীতি। প্রাচ্যের দর্শনচিন্তা এবং ধর্মীয় বিশিষ্টতার কোনো গুরুত্ব যেমন ডিউইতে দেওয়া হয়নি

তেমনি অবহেলিত হয়েছে সাহিত্যও। বিশ্বভারতীতে প্রবর্তিত এই পরিবর্তিত রীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, তাহ'লে ডিউইর একটি এশীয় সংস্করণের কথা ভাবলে কেমন হয়। আমি বলেছিলাম, তাতে মূল নীতি ঠিক থাকে না, এবং ক্রমে আফ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য ভূভাগের জন্যও বিশেষ সংস্করণের কথা ভাবতে হ'তে পারে। তার চেয়ে ডিউইর মধ্যেই এই সম্প্রসারণের অঙ্কুর রেখে দেবার কথা ভাবা উচিত—যাতে প্রতি দেশ তার অনুকূলে এটিকে ভিত্তি ক'রে নিজেদের প্রকল্প গ'ড়ে নিতে পারে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন দেশে র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ অনুকূলে সংশোধিত বা সুবিধাজনক রীতি প্রবর্তন ক'রে থাকেন। ডিউইর মধ্যেই তার বীজ থাকলে সব মিলিয়ে একটা ঐক্য থাকবে।

ডিউই প্রকল্প বিভাগ তখন ষোড়শ সংস্করণের কাজ করছিলেন, এবং তাঁরা বোধ হয় এশিয়া প্রভৃতি দেশের কথাও চিন্তা করছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের পরিবর্তিত ডিউইর একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো শ্রীমতী এঙ্গলেময়ারকে দিই, এবং দেশে ফিরে এসে সেটির আরেকটু বিস্তারিত তালিকা ক'রে তাঁকে পাঠিয়ে দিই। আমার আমেরিকা প্রবাসের স্বল্পকালে, এবং দেশে ফিরে আসবার পরেও শ্রীমতী এঙ্গলেময়ার ডিউই ষোড়শ সংস্করণের বিভিন্ন বিভাগের একটি ক'রে অগ্রিম মুদ্রিত প্রতিলিপি আমাকে পাঠিয়ে দিতেন। এবং তাঁর আহ্বান মতো আমি অকিঞ্চিৎকর কিছু মন্তব্য ক'রে পাঠাবার স্পর্ধাও করেছিলাম।

তারই কিছুকাল পরে শ্রীমতী এঙ্গলেময়ার কার্যসূত্রে দুই দফায় শ্যামদেশে আসেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর পূর্বপ্রস্তাবিত এশীয় প্রকল্পের কথা ভেবে এখানে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁকে শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত কেশবন প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে আলোচনা করবার প্রস্তাব দিই। তাঁর ভ্রমণসূচীতে শান্তিনিকেতনে আসবার মতো সময় ক'রে উঠতে পারেননি বা প্রভাতবাবুও যেতে পারেননি, তবে শ্রীযুক্ত কেশবন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল বলেই আমি জানি। তারপরে দীর্ঘকাল এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। বৃহত্তর পরিবেশের সন্ধান দিয়েই আমি কর্তব্য শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলাম। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে গ্রন্থবিজ্ঞানীরা ভাবছেন এটি সুখের বিষয়।

এ ব্যাপারে ভারতের গ্রন্থাগার সংস্থাগুলি যদি এগিয়ে আসেন তাহ'লেই ভরসার কথা। কার্যকর ক্ষেত্রে ভারতীয় বিষয়াবলীর বর্গীকরণ পদ্ধতি আমাদেরই বার ক'রে নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ডিউই প্রকল্পের সপ্তদশ সংস্করণ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সকলেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, এতে ৯৫৪ বর্গ বিভাজনে ভারত বা 'ইণ্ডিয়া' নামটি না দিয়ে তার স্থলে 'সাউথ এশিয়া' নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। এটি যদি কোনোপ্রকার মুদ্রাকর-প্রমাদ হ'য়ে থাকে, অথবা অনবধানতা বশত ভ্রান্তি ঘটে থাকে তাহ'লেও বিস্ময়ের কমতি হয় না। কেন না, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের বিচক্ষণ সম্পাদকবর্গ এ ধরনের একটা ভুল ক'রবেন সে অস্বাভাবিকতাও মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু ৯৫৪ বর্গভাগকে যে নামেই জাহির করা হোক না কেন, সেটি সর্বতোভাবে ভারতবর্ষকেই বোঝাচ্ছে। এর বিভাগ এবং উপবিভাগ সবই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কেন্দ্র ক'রে। তাহলে 'ইণ্ডিয়া' নামটি বর্জন ক'রবার যুক্তি কি? ব্যাপারটা স্বভাবতই নানাবিধ সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণটা কি পাকিস্তানকে খুশি ক'রবার জন্যে? যদিও 'পাকিস্তান' এই বর্গ বিভাগের মধ্যেই ৯৫৪.৯ পর্যায়ে স্থান পেয়েছে, (ষোড়শ সংস্করণে ছিল ৯৫৪.৭), তবু মনে হ'তে পারে যে পাকিস্তান হয়তবা স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ভারতের বর্গভুক্তিতে আপত্তি জানিয়েছে ব'লেই দক্ষিণ এশিয়া নামটির সৃষ্টি। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি সামগ্রিক ভাবে দক্ষিণ এশিয়া হ'য়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে পাকিস্তান লাভবান হচ্ছে কেমন ক'রে? না কি, হয়ত বা ভবিষ্যতে পাকিস্তানকে আরো বিশিষ্ট মর্যাদা দেবার ভিত্তি হিসেবেই এই নব নামকরণ, এবং হয়ত বা ভারতবর্ষকে পাকিস্তানী পদ্ধতিতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'হিন্দুস্থান' বানাবার সংকীর্ণ প্রচেষ্টার সূত্র ধ'রেই সূক্ষ্ম কায়দায় ডিউইর জমি তৈরি হ'য়ে রইল?

একথা মনে ক'রবার সপক্ষে যুক্তি হিসেবে আরো বিস্তারিত পর্যালোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। 'ইণ্ডিয়া' যে উক্ত সংস্করণ-সপ্তদশী পণ্ডিতদের অজ্ঞাত তা নয়। ৯৩০ বর্গভাগ দেখুন,—সেখানে প্রাচীন ইতিহাসের পর্যায়ে ৯৩৪ বিভাগে 'ইণ্ডিয়া' নামটি মুদ্রিত দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অস্তিত্ব কেবলমাত্র অতীতেই, তার কোনো বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই!

দ্বিতীয়ত, ৯৫৪.৯ বিভাগে পাকিস্তানের বর্গ-সম্প্রসারণ লক্ষ্য করুন। ৯৫৪.০১,

—'০২, —'০৩ ইত্যাদি ক্রমে যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্ব-পর্যায় দেখানো হয়েছে, সেই ধারা অনুক্রমেই ৯৫৪.৯০১,—'৯০২,—'৯০৩ ইত্যাদি সাজানো হবে ব'লেই বুঝি স্থানগুলি শূন্য। কেননা, এখানে লিপিবদ্ধ করার মতো মাল-মশলা কিছু নেই। তবে কেন এই পর্বক্রম? কেবলমাত্র কি ভারতবর্ষের (দক্ষিণ এশিয়ার!) বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই? দেখেশুনে মনে হয় যেন ভাবখানা এই যে পাকিস্তানের 'প্রাচীন' ইতিহাসের অলক্ষ্য পর্বপর্যায় এখানে গ্রহণ করা যাবে ভবিষ্যতে। যে দেশের কোনো অস্তিত্ব ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছিল না, সে দেশের পূর্বতন ইতিহাস যে কী হ'তে পারে তা আমাদের পাণ্ডিত্য বর্জিত মগজে আসে না। হয়ত বা 'মার্কিনী সভ্যতার হাজার বছর' জাতীয় পরিকল্পের মতো 'পাকিস্তানের হাজার বছর' জাতীয় প্রসঙ্গকেও স্বীকৃতি দিয়ে সৃষ্টির আদিমতম কাল থেকে পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রদর্শনের অভিনব প্রকল্প এই সূত্রে তৈরি হ'য়ে যাবে। আরো মজা দেখুন, ৯৫৪.৯০৪ উপবিভাগে 'ইন্‌ডেপেন্‌ডেন্‌স্‌' কথাটি মুদ্রিত আছে। অর্থাৎ 'পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ'। কার পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ? জন্মলাভের পূর্বেই পরাধীনতা? ইংরেজের, না ভারতবর্ষের? ব্রিটিশ রাজত্বের আওতা থেকে মুক্তি, না কি ভারতবর্ষের 'বজ্রমুষ্টি' থেকে স্বাধীনতা লাভ?

স্পষ্টতই এমন সন্দেহ করাটাও আশ্চর্যের নয় যে এর পিছনে কোনো একটা মতলব কাজ করছে। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো ডিউই প্রকল্পের মধ্যেও বুঝিবা রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। জ্ঞানের পর্যায় অনুযায়ী বর্গ বিভাজনের বদলে রাষ্ট্রনীতিক উদ্দেশ্যের মোড়কে মুড়ে জাহির ক'রবার প্রয়াস দেখা দিচ্ছে। সপ্তদশ সংস্করণের এশীয় বর্গ প্রযুক্তির পটভূমিকা রচনার সুবাদে শ্রীমতী সারা ভাণের (Sarah Vann) এতদঞ্চল সফর এবং সরেজমিন পর্যালোচনা ঘটেছিল। শ্রীযুক্ত বি. এস কেশবন প্রমুখ গ্রন্থাগার বিশারদের নামও এই সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত আছে। অনুমান করি, এই প্রকল্পের অগ্রিম ছকও তাঁদের কাছে প্রেরিত হ'য়ে থাকবে। তৎসত্ত্বেও এধরনের অসঙ্গতি কি আশ্চর্যজনক নয়?

এখন আমার মূল বক্তব্য বিষয়ে ফিরে গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্প্রসারিত এবং পরিবর্তিত রীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়-তালিকা নিবেদন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই শান্তিনিকেতনে এসে সমগ্র প্রকল্পটি দেখে যেতে পারেন।

৮১০	ভারতীয় সাহিত্য
৮১১	সংস্কৃত মহাকাব্য
৮১১.১	রামায়ণ
৮১১.২	মহাভারত
৮১১.৩	কালিদাস
৮১২	সংস্কৃত নাটক
৮১৩	খণ্ডকাব্য
৮১৪	গদ্যকাব্য
৮১৫	চম্পূকাব্য
৮১৬	কথা-সাহিত্য
৮১৭	বিবিধ
৮১৮	প্রাকৃত সাহিত্য
৮১৯	অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য
৮১৯.৩	হিন্দী-সাহিত্য
৮১৯.৪	বাংলা সাহিত্য
৮১৯.৪১	বাংলা কাব্য
৮১৯.৪৯	অসমীয়া সাহিত্য
৮১৯.৫	ওড়িয়া সাহিত্য
৮১৯.৮	দ্রাবিড় ভাষাবর্গের সাহিত্য
৮২০	ইংরেজি সাহিত্য
৮৬৯	পর্তুগীজ সাহিত্য
৮৮০	গ্রীক সাহিত্য
৮৯০	অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্য
৮৯১	পশ্চিম এশীয়
৮৯১.৫	পারসিক
৮৯৪	মধ্য এশীয়
৮৯৫	এশীয়
৮৯৫.১	চীনা সাহিত্য
৮৯৫.২	জাপানী সাহিত্য
৮৯৬	আফ্রিকান সাহিত্য
৪১০	ভারতীয় ভাষা
৪১১	সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব
৪১১.১	সংস্কৃতের উৎপত্তি
৪১১.৫	ব্যাকরণ
৪১২	প্রাকৃত ভাষাতত্ত্ব
৪১৩	পালি
৪১৫	আর্য ভাষাবর্গ
৪১৫.৩	হিন্দী
৪১৫.৪	বাংলা
৪১৫.৪৯	অসমীয়া
৪১৫.৫	ওড়িয়া
৪১৬	মুণ্ডা ভাষাবর্গ
৪১৭	তিব্বত-চীন ভাষাবর্গ
৪১৭.১	তিব্বতী
৪১৭.২	পার্বত্যাঞ্চল
৪১৮	দ্রাবিড় ভাষাবর্গ
৪১৯	অষ্ট্রিয়া-এশীয় ভাষা
৪১৯.৩	খাসি
৪২০	ইংরেজি ভাষা
৪৬৯	পর্তুগীজ
৪৮০	গ্রীক
৪৯০	অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষা
৪৯১	ইন্দো-য়ুরোপীয়
৪৯৫.১	চীনা ভাষা
৪৯৫.২	জাপানী ভাষা
৪৯৬	আফ্রিকান ভাষা
২২০	ভারতীয় ধর্ম
২২১	বৈদিক ধর্ম

২২১.১	ঋগ্বেদ সংহিতা	২৪৮	দক্ষিণ ভারতীয়
২২২	উপনিষদ	২৪৯	বিবিধ
২২৩	গীতা	২৫০	বৌদ্ধধর্ম
২২৪	ভক্তিবাদ	২৫৫	উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধ
২২৪.১	ভাগবত	২৫৬	তিব্বতী, লামাতন্ত্র
২২৫	পুরাণ	২৫৭	চীনা বৌদ্ধ
২২৬	তন্ত্র	২৫৮	জাপানী বৌদ্ধ
২২৭	স্তোত্র, ইত্যাদি	২৫৯	মধ্য এশীয় বৌদ্ধ
২২৮	পৌরাণিক কাহিনী	২৬০	জৈনধর্ম
২২৯	ভারতীয় সমাজ বিন্যাস	২৭০	খ্রীষ্টধর্ম
২৩০	হিন্দুধর্ম (প্রাচীন)	২৮০	মুসলমান ধর্ম
২৩১	শৈব	২৮১	কোরাণ
২৩২	শাক্ত	২৮৪	সুফী সম্প্রদায়
২৩৩	সৌর গাণপত্য	২৯০	অন্যান্য, আলোচনা
২৩৪	বৈষ্ণব (মধ্যযুগ)	২৯১	তুলনামূলক
২৩৫	বৈষ্ণব	২৯২.৫	জরথুস্ত্র
২৩৬	মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারক	২৯৩	অবলুপ্ত ধর্ম
২৩৭	শিখ	২৯৪-২৯৯	প্রাগৈতিহাসিক, পৌরাণিক, উপকথাদি
২৩৮	দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কারক		
২৩৯	বিবিধ	১৮২	ভারতীয় দর্শন
২৪০	হিন্দুধর্ম (আধুনিক)	১৮২.০১	ষড়দর্শন
২৪১	ব্রাহ্ম-সমাজ	১৮২.০২	তুলনামূলক
২৪২	আর্য সমাজ	১৮২.১	ন্যায়-অক্ষপাদ গৌতম
২৪৩	রামকৃষ্ণ মিশন	১৮২.২	বৈশেষিক—কনাদ
২৪৪	আধুনিক সম্প্রদায়	১৮২.৩	সাংখ্য—কপিল
২৪৪.৮	শ্রীঅরবিন্দ	১৮২.৪	যোগ—পতঞ্জলি
২৪৫	উত্তর ভারতীয় সম্প্রদায়	১৮২.৫	মীমাংসা—জৈমিনী
২৪৬	বোম্বাই সম্প্রদায়	১৮২.৬	বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র—বাদরায়ণ
২৪৭	গুজরাট সম্প্রদায়	১৮২.৭	শৈব

১৮২.৮	শাক্ত
১৮২.৯	বিবিধ
১৮৩	ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গ
১৮৩.১	অধিবিদ্যা
১৮৩.১১	তত্ত্ববিদ্যা
১৮৩.১৩	সৃষ্টিতত্ত্ব
১৮৩.১৬	জীব, অজীব
১৮৩.২	অধিবিদ্যা প্রসঙ্গ
১৮৩.২৩	মুক্তি
১৮৩.২৮	আত্মা
১৮৩.৩	দেহ ও মন
১৮৩.৩৩	ইন্দ্রজাল, ভানুমতী
১৮৩.৩৭	স্বভাব
১৮৩.৪	ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ
১৮৪	ভারতীয় দর্শন : সাম্প্রতিক
১৮৫	বৌদ্ধ দর্শন
১৮৬	জৈন দর্শন
১৮৭	মুসলিম দর্শন
১৮৮	প্রাচীন গ্রীক দর্শন
১৮৯	প্রাচীন খ্রীষ্টিয়, মধ্যযুগীয়
১৯০	আধুনিক ইউরোপীয়
১৯৯	অন্যান্য
৩৫৪	ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান
৩৪৫.১	পরিসংখ্যান
৩৫৪.২	রাজনীতি
৩৫৪.৩	অর্থনীতি
৩৫৪.৪	গ্রামীণ, কৃষি-বিজ্ঞান
৩৫৪.৫	প্রশাসন, পরিচালনা
৩৫৪.৬	সমাজ কল্যাণ
৩৫৪.৭	কুটির শিল্প
৩৫৪.৮	শিল্প, বাণিজ্য
৩৭৪	ভারতীয় শিক্ষা
৩৭৪.১	শিক্ষক, শিক্ষাধারা, শৃঙ্খলা
৩৭৪.২	প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩৭৪.৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৩৭৪.৪	পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, মক্তব
৩৭৪.৫	পাঠক্রম
৩৭৪.৬	স্ত্রীশিক্ষা
৩৭৪.৭	শিক্ষকদের শিক্ষা
৩৭.৪৮	কারিগরি, বিশেষ শিক্ষা
৯৫৪	ভারতীয় ইতিহাস
৯৫৪.১	প্রাচীন
৯৫৪.১১	প্রাক্-বৈদিক ইতিহাস
৯৫৪.১৩	মৌর্য
৯৫৪.১৫	গুপ্তযুগ
৯৫৪.১৯	দক্ষিণ ভারত
৯৫৪.২	মধ্যযুগ মুসলমান পর্ব
৯৫৪.৩	পরিবর্তন যুগ
৯৫৪.৪	ব্রিটিশ পর্ব
৯৫৪.৫	স্বাধীনতা সমর
৯৫৪.৬	স্বাধীন ভারত
৯৫৪.৮	ভারতীয় স্বাধীন রাজ্য
৯৫৪.৯	বিভিন্ন প্রদেশ
৯৫৪.১	প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা
৯৫৪.১ : ১০	সাংস্কৃতিক ইতিহাস
৯৫৪.১ : ২০	ধর্মীয় ইতিহাস
৯৫৪.১ : ৩০	সামাজিক ইতিহাস
৯৫৪.১ : ৪০	ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস

৯৫৪.১ : ৫০ হিন্দু বিজ্ঞান
৯৫৪.১ : ৬০ ঐ ব্যবহারিক
৯৫৪.১ : ৭০ শিল্পেতিহাস
৯৫৪.১ : ৮০ ঐতিহাসিক,
—ভৌগোলিক তত্ত্ব
৯৫৪.১ : ৯০ বৃহত্তর ভারত
৯৫৪.১ : ৯১ চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি
৯৫৪.১ : ৯৩ মধ্য এশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতি

[এইভাবে ৯৪২ (ইংলণ্ড) ৯৫৩ (আরব) প্রভৃতিরও বিভাগ করা যায় ।]